দাম ঃ পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

কাশ্মীর বিশেষ সংখ্যা

১৩ ডিসেম্বর, ২০১০

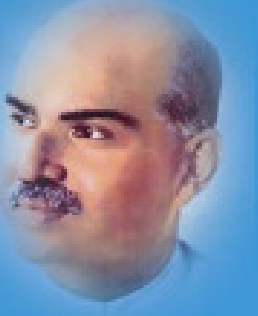

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

কাশ্মীর ভারতের মুকুটমণি ❑ বিদ্যুৎ মুখার্জী ❑ ৭

মহারাজা হরি সিং-এর লেখা 'বিলয় পত্র' ❑ ১০

৩৭০ ধারাই ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস ❑ এস গুরুমূর্তি ❑ ১১

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত ঃ স্বশাসনের কথা বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ❑ আর এস এস ❑ ১৫

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাশ্মীর সমস্যা ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑ ১৯

জঙ্গিস্থান কাশ্মীর ❑ অর্ণব নাগ ❑ ২৩

কাশ্মীরে অশান্তির পেছনে পাকিস্তান ❑ মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি ❑ ২৭

কাশ্মীর এবং আর এস এস ❑ ৩১

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, প্রচ্ছদে সেই চারজন হলেন শ্রীগুরুজী (উপরে বাঁ দিক থেকে) ও মহারাজা হরি সিং এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (নীচে বাঁদিক থেকে) ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্ররোচনায় আজ রক্তঝরা কাশ্মীর—রক্তাক্ত ভারতবর্ষ।

স্বস্তিকা
কাশ্মীর বিশেষ সংখ্যা
৬৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা,
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১২
১৩ ডিসেম্বর - ২০১০

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর ঃ ভারতের আত্মঘাতী প্রবণতা

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর শুধু নিজেদের রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, তাহারা এবং তাহাদের এজেন্টরা এখন ভারতের বিভিন্ন শহরে যাইয়া সভা-সেমিনার করিতেছে এবং বাক্-স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য প্রচার করিতেছে। ভারত তাহাদের কাছে 'ভুখে-নাঙ্গে-হিন্দুস্থান'। এই হিন্দুস্থান হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া 'আজাদ কাশ্মীর' গড়িতে চায়। পূর্ব-পাকিস্তানকে (অধুনা বাংলাদেশ) বিচ্ছিন্ন করিবার প্রতিশোধ লইতে পাকিস্তান কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং এইজন্য সর্বপ্রকারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়াই চলিতেছে।

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এখন 'ফ্যানাটিক' তালিবানদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। আই এস আই—আল কায়দার যৌথ মদতে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব। রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ এখন এমন কিছু মানুষের হাতে যাহাদের কাছে জেহাদের বিকল্প কিছু নেই। যে কোনও মূল্যে কাশ্মীরে 'ইসলামিক জম্-হুরিয়ত' প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে।

খোদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির বিষয়টি চুক্তি মাত্র—চূড়ান্ত নয় বলিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পালে হাওয়া যোগাইয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং সর্বদলীয় ও উচ্চস্তরীয় বৈঠক করিয়াছেন। কাশ্মীরে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠাইয়াছেন। বিজেপি প্রতিনিধিদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই প্রতিনিধিদের কয়েকজন সদস্য আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পরে কেন্দ্র সরকার কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সূত্র সন্ধানে দিলীপ পদগাঁওকর-এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট যে মধ্যস্থকারীর দল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা পাকিস্তানকেও একটি পক্ষ করিতে হইবে বলিয়া মন্তব্য করিয়া সমাধান তো দূরের কথা, সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া যে সরকার বার বার ঘোষণা করিতেছে, সেই সরকারেরই নিযুক্ত প্রতিনিধি দল কেমন করিয়া এমন মন্তব্য করিতে পারে? তাহা হইলে কি সরিষার মধ্যেই ভূত আছে?

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরের প্রশ্নটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিবেচনাধীন বলিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন এবং যাহার মাশুল আজও গুণিতে হইতেছে, সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন কেন্দ্র সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী দল।

১৯৪৮ সালেই এই আত্মঘাতী প্রবণতা শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় বাহিনী যখন সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে লইয়া আসিয়াছে, তখনই যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দিয়া জওহরলাল নেহরু এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে মহারাজ হরি সিং-এর প্রদত্ত পত্র অনুযায়ী কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতোই একটি প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইত। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রাজ্যের প্রশ্নই উঠিত না। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবার একটি সুবর্ণ সুযোগ অসিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীর লইয়া দর কষাকষি করিতে ব্যর্থ হইলেন। বরং এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের হাতে বন্দী পাকিস্তানের প্রায় এক লক্ষ সেনাকে ফিরিয়া লইয়া গেলেন তৎকালীন পাক্-প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো। এরপরও রাজ্যপাল হিসাবে জগমোহন যখন জঙ্গিদের বিষ দাঁত ভাঙিতে শুরু করিয়াছেন তখন রাজীব গান্ধী ও ফারুক আবদুল্লা নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শেষমেশ ভি পি সিং-এর আমলে তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে ফিরাইয়া আনা হইল।

এখনও সেই আত্মঘাতী প্রবণতার ধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলিতেছেন, কাশ্মীরীদের আবেগকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। হিংসা বর্জন করিলে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসিয়া মীমাংসায় আসিতে পারেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে তিনি কি আলোচনা করিবেন? কাশ্মীরীদের স্বশাসনের নামে এক স্বতন্ত্র ইসলামিস্তান স্থাপনে রাজি হইবেন?

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তাহা পাক্-অধিকৃত কাশ্মীরসহ। বস্তুত শুধু হরি সিং-এর পত্রের জোরেই নয়—সুপ্রাচীনকাল হইতেই ঐতিহাসিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য এই সত্যকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাইবে না। এই মর্মে ১৯৯৪ সালে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। তাই পূর্বসূরীদের আত্মঘাতী প্রবণতাকে ভুলিয়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র ইতিহাসের শিক্ষাই হইবে তাহার পথপ্রদর্শক।

কাশ্মীর ভারতের মুকুটমণি

বিদ্যুৎ মুখার্জী

কাশ্মীর ভারতের মুকুট। কাশ্মীর ছাড়া ভারতের কল্পনা অসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাল থেকেই এই প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতের সংস্কৃতির উন্নত রূপ কাশ্মীরে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষারও একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল কাশ্মীরে। বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুরা কাশ্মীরের সুরম্য স্থানে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আসত। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত, পথ এখানে পুষ্পিত-পল্লবিত হয়েছে। ঋষি-মুনিরা, ত্যাগী-তপস্বীরা নিজ তপস্যা ক্ষেত্র হিসাবে এই ভূমিকে পূণ্য করেছেন।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুপ্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার এবং ইতিহাসবিদ কল্‌হন 'রাজতরঙ্গিনী'-তে কাশ্মীরের ইতিহাস লিখেছেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সমগ্র ক্ষেত্রকে বসবাস যোগ্য হিসাবে তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র নীল এখানকার প্রথম শাসক হিসাবে রাজত্ব করেছেন। ধরিত্রীর এই স্বর্গভূমিতে উপদ্রবের ইতিহাসও রাজা নীলের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। রাক্ষসী প্রবৃত্তি ভাবাপন্ন জলোদ্‌ভব কাশ্মীরে উৎপাত শুরু করলে মহর্ষি কশ্যপ আর্যাবর্তের অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে এই অত্যাচারীকে দমন করেছিলেন। তারপর বেশ কিছু প্রজন্ম পর্যন্ত রাজা নীলের বংশধররা এখানে শাসনকার্য চালান। ত্রেতা যুগে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের পুত্র লবও কাশ্মীরসহ সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাম-রাজ্যের মর্যাদা বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল 'লবপুর' (আজকের লাহোর) । দ্বাপর যুগে গোলদ এখানকার অধিপতি ছিলেন। ইনি ছিলেন জরাসন্ধের প্রিয় বন্ধু। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিছুদিন পর তাঁর পুত্র দামোদরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণী যশোমতীকে বিধিবৎ অভিষেক করে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন। পরে যশোমতীর পুত্র গোনন্দ (দ্বিতীয়) কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল কাশ্মীর। তাঁর পুত্র সম্রাট অশোক আজকের রাজধানী শ্রীনগর তৈরি করেছিলেন। অশোকের পুত্র জালৌক সেসময় কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্রীনগরে ক্ষীরভবানী মন্দির

একশ' বছর পর ভারতে কুষাণ আক্রমণ শুরু হয় এবং বৌদ্ধ উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করে কুষাণরাজ কণিষ্ক চক্রবর্তী রাজারূপে কাশ্মীরে শাসন প্রারম্ভ করেন। উত্তর ভারতের নাগ-বংশীয় রাজারা সম্মিলিত আক্রমণ চালিয়ে কণিষ্ককে পরাস্ত করেন।

'ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়' কুষাণ সম্রাটরূপে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পর শক এবং হূণ এখানে এসে পৌঁছেছিল। হূণ রাজা মিহিরকূল কাশ্মীরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কাশ্মীরকেও জয় করে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় করকোটা বংশ এই প্রদেশে রাজত্ব করছিলেন। চীনের পর্যটক হিউ এন সাং তাঁর যাত্রা বৃত্তান্তে তৎকালীন কাশ্মীর নরেশ দুর্লভ বর্দ্ধনের উল্লেখ করেছেন। এই বংশের সবথেকে প্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন সম্রাট ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়। উনি ৭২৪ থেকে ৭৬১ সন্ পর্যন্ত রাজত্ব করে উজ্জয়িনী তথা থানেশ্বর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের বংশধর যশোবর্মনকে সাথে নিয়ে তিনি মুসলিম আক্রমণকারীদের সীমান্তেই পরাস্ত করে সেই সময়ে ভারতের সবথেকে শক্তিশালী সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। মহাকবি ভবভূতি এবং বাক্‌পতিরাজ ওই সময় কাশ্মীরে কালজয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন।

যশোবর্ধনের পরে সম্রাট অবন্তীবর্মন (৮৫৫-৮৮৩ খৃস্টাব্দ) এবং জয়সিংহ (১১২৮-৫৫ খৃস্টাব্দ) কাশ্মীরের ক্ষমতাশালী এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। মহারাজ অবন্তীবর্মনের ২৮ বছরের রাজত্বকালে কাশ্মীরে চরম উৎকর্ষের সময় ছিল। রাজা জয়সিংহও এই প্রদেশকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করেছিলেন। ১৩৩৯ খৃস্টাব্দে আক্রমণকারী গজনীর সুলতান প্রথম মুসলমান শাসক হিসাবে শাসন শুরু করেন এবং পরবর্তী পাঁচশ' বছর কাশ্মীরে সুলতান, আফগান এবং মোগলদের আধিপত্য ছিল। ১৫ জুলাই ১৮১৯-এ মহারাজা রণজিৎ সিংহের সেনাপতি পণ্ডিত দীবল চন্দ্র মিশ্র মুসলিম শাসক গববর খানকে বন্দী করে কাশ্মীরকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর সময়েই পাঞ্জাবের রাজা জম্মুরাজ্যের ডোগরা সেনাপতি গুলাব সিংহকে সম্মান জানিয়েছিলেন। ১৬ই মার্চ ১৮৪৬-এ 'অমৃতসর সন্ধি'-র পর রাজা গুলাব সিংহ জম্মু-কাশ্মীরের অধিপতি হয়েছিলেন। ইংরেজদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতার সময় তাঁর নাতি হরি সিংহ কাশ্মীরের রাজা হিসাবে শাসন করছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র

প্রাচীনকাল থেকেই কাশী এবং কাশ্মীর ভারতের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কাশীর বিদ্বান ও পণ্ডিতদের শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য কাশ্মীরে একবার যেতেই হোত। আজকেও কাশীতে বালকদের 'অক্ষর-জ্ঞান'-অনুষ্ঠানের সময় যজ্ঞ-উপবীত হাতে নিয়ে কাশ্মীরের দিকে সাত পা চলার রীতি প্রচলিত আছে। খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রণেতা যীশুও প্রথমে কাশী এবং পরে কাশ্মীরে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। চীনা পর্যটক হিউ-য়েন-সাঙ সংস্কৃত অধ্যয়ন করার জন্য কাশ্মীরে এসেছিলেন।

সেই সময় সংস্কৃত অধ্যয়নের মূলস্থান ছিল কাশ্মীর। শ্রীনগরের সন্নিকটে সেই সময় বিশাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে সমগ্র বিশ্বের ছাত্রসমাজ সংস্কৃত পড়াশোনার জন্য আসত। গুরু নানকদেবের সুপুত্র বাবা শ্রীচন্দ এবং মোগল দারাশিকোহ এই সংস্থাতেই সংস্কৃত শিখেছিলেন। মুসলিম পর্যটক আল-বেরুণী লিখেছেন—"কাশ্মীর হিন্দু বিদ্বানদের সব থেকে বড় পাঠশালা। দূরের এবং কাছের দেশের লোকেরা এখানে সংস্কৃত শিখতে আসতেন।" সেইজন্যই কাশ্মীরবাসীদের পরবর্তী সময়ে 'পণ্ডিত' সম্বোধন করা শুরু হয়েছিল। ভারতের লোকেরা কাশ্মীরের সমস্ত লোককে বিদ্বান এবং পণ্ডিত বলে স্বীকার করতেন। ধরিত্রীর স্বর্গ বলে অভিহিত কাশ্মীর আমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হোত। হিন্দু সংস্কৃতির 'জীবনমূল্য'-র উৎকর্ষ এখানে দেখা গেছে। শৈব এবং বৌদ্ধ উপাসনা পদ্ধতি এখানে ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়েছে। আদি শংকরাচার্যের দিগ্বিজয়ে কাশ্মীর এক মহত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কণিষ্কের সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধদের এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। বৌদ্ধ মতের 'মহাযান' শাখা সৃষ্টি এবং বিস্তার কাশ্মীর থেকেই শুরু হয়েছে।

মহারাজা ললিতাদিত্য এখানে এক বিশাল সূর্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার ভগ্নাবশেষ আজও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণের কেন্দ্র। বিখ্যাত তীর্থ অমরনাথ ছাড়াও সুরেশ্বর, ত্রিপুরেশ্বর, হর্ষেশ্বর, জ্যেষ্ঠেশ্বর, শিবভূতেশ্বর, ভবভূতি, বাক্‌পতিরাজ, ভোগরাজ এবং শ্রীবরের মতো বিদ্বান লেখকদের এই মাটিতেই জন্ম হয়েছিল। ভারতের ষড় দর্শনের বিকাশে কাশ্মীরের ঋষিদেরও যোগদান ছিল।

সামরিক মহত্ব

এটা খুবই পরিষ্কার বহু প্রাচীনকাল থেকে কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো কাশ্মীরকেও আক্রমণ করে এবং কিছু সময়ের জন্য তাদের আধিপত্য রাখে। কিন্তু খুব বেশীদিন তারা রাজত্ব করতে পারেনি;

পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিক গুরুত্বের সাথে সাথে কাশ্মীরের সামরিক মহত্বও উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে সেখান থেকে সমস্ত এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কণিষ্ক, ললিতাদিত্য এবং অবন্তীবর্মণের সময় তাদের সাম্রাজ্যে চীন এবং পশ্চিম এশিয়ার ভূ-ভাগও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট ললিতাদিত্য চীনের বর্তমান রাজধানী বেজিং-কেও জয় করে নিয়েছিলেন। কাশ্মীরের এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই চীন, আমেরিকা এবং ইউরোপ পাকিস্তানের মাধ্যমে এখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছে। গিলগিটের অংশ পাকিস্তানের অধিকারে চলেই গেছে। গিলগিটের সামরিক গুরুত্ব অনুভব করে ইংরেজরা ১৯৩৪ সালে মহারাজা হরি সিংহের কাছ থেকে ৬০ বছরের জন্য তা নিয়ে নিয়েছিল। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর ইংরেজরা এটা ফেরৎ দেওয়ার লোক-দেখানো অভিনয় করেছিল। গিলগিটের তৎকালীন প্রশাসক মেজর ব্রাউন গিলগিটকে ব্রিগেডিয়ার ঘনসারা সিংহকে সমর্পণ তো করে দিয়েই ছিলেন, কিন্তু মুসলিম সেনাদের বিদ্রোহ তৈরি করিয়ে মেজর ব্রাউন নিজেই সেখানে পাকিস্তানি পতাকা পর্যন্ত উড়িয়ে দেন।

সেইসময় পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চীন রাস্তা তৈরি করার জাল বিস্তার করেছিল। আমেরিকান সৈনিকরা সৈনিক ডেরাও তৈরি করে ফেলেছিল। লাদাখ অঞ্চলের লেহ-র অনেক অংশ চীনের অবৈধ কব্জাতে আছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি জোরালো হওয়া দরকার। ভারতের মুকুটমণি কাশ্মীরের নিরাপত্তা আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

উপত্যকায় সদাসতর্ক সেনাবাহিনী।

মহারাজা হরি সিং-এর লেখা ‘বিলয়-পত্র’

জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিং নিজের রাজ্যকে ভারতের মধ্যে অঙ্গীভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জম্মুর রাজপ্রাসাদ থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ২৬ অক্টোবর লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ‘বিলয় পত্র’ লিখেছিলেন। এই ‘বিলয় পত্র’-এর ভিত্তিতেই জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিভাজ্য অঙ্গহিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ‘বিলয় পত্র’-টি এখানে প্রকাশ করা হলো।

এর কারণ হলো ভারতীয় স্বতন্ত্রতা অধিনিয়ম ১৯৪৭ ধারা (প্রাবধান) অনুসারে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ১৫ আগস্ট তারিখে এক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র (অধিরাজ্য) হিসাবে ‘ভারত’ গঠিত হবে এবং গভর্নর জেনারেল-এর নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট কিছু ধারা ছেড়ে দিয়ে বা যুক্ত করে, কিছু অঙ্গীভূত বা সংশোধন করে ভারতীয় শাসন আইন (অধিনিয়ম), ১৯৩৫, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রযোজ্য হবে।

এর কারণ হলো গর্ভনর জেনারেল-এর স্বীকৃত (অঙ্গীকৃত) ভারত শাসন অধিনিয়ম, ১৯৩৫-এর ধারা (প্রাবধান) অনুসারে ভারতীয় রাজ্যগুলি নিজেদের শাসকদের লেখা ‘বিলয় পত্র’ অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হতে পারে।

মহারাজা হরি সিং

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

তাই এখন আমি শ্রীমান ইন্দ্রমোহন কাশ্মীর-এর রাজা তথা তিববত ইত্যাদি হিসাবে তথা ওই সব রাজ্যের উপর এতদ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গীভূত কার্যকর করছি।

১. আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে হচ্ছি যে ভারতের গভর্নর জেনারেল, (সুপ্রীম কোর্ট) এবং যুক্তরাষ্ট্রগুলির প্রয়োজনে (অধিকরণ)—এই ‘বিলয় পত্র’-এর ভিত্তিতে এবং কেবল যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনেই, জম্মু-১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সময় ভারত শাসন অধিনিয়ম ১৯৩৫-এর অন্তর্গত ধারাসমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

রাজরাজেশ্বর শ্রী হরি সিংহজী জম্মু ও দেশাধিপতি, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের শাসক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বলে করবার জন্য এই লিখিত বিলয়পত্র

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের বিধানসভা, যুক্তরাষ্ট্রের আদালত স্থাপিত অন্য যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই বিলয় পত্রে লিখিত ধারা অনুযায়ী কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে, যা

২. আমি এতদ্বারা দায়িত্বের সঙ্গে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে জম্মু-কাশ্মীরে আইনের ধারাগুলি (প্রাবধান) গুরুত্বের সঙ্গেই কার্যকর করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিলয় পত্রের মূল বিষয়ের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।

৩. বিলয় পত্রে যেসব বিষয়ের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (সংসদ) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ণ করতে পারে।

৪. আমি এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে বিলয়ের কথা ঘোষণা করছি, যদি গর্ভনর জেনারেল ও রাজ্যের শাসকদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয় যা বিলয় পত্রে উল্লেখ করা হয়নি, তখন এমন কোনও সমঝোতাও বিলয় পত্রের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হবে।

৫. আমার এই বিলয় পত্রে উল্লেখিত শর্ত ভারতীয় স্বতন্ত্রতা অধিনিয়ম, ১৯৪৭-এ কোনও সংশোধনের দ্বারা পরিবর্তিত করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংশোধন বিলয় পত্রের মূল ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৬. এই বিলয় পত্র অনুযায়ী কোনও উদ্দেশ্যে জমি অনিবার্যভাবে অধিগ্রহণের জন্য আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকবে না। কিন্তু একথাও ঘোষণা করছি যে যদি ওই আইন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সেই জমি অধিগ্রহণ করা হবে। আর যদি জমি আমার হয় তবে হয় আমি ওই জমির শর্তাবলী অনুযায়ী কিংবা কোনও সমঝোতার অভাবে ভারতের প্রধান বিচারপতির নিযুক্ত কোনও মধ্যস্থতাকারীর নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী হস্তান্তর করব।

৭. ভারতের ভবিষ্যৎ (ভাবী) সংবিধানের যে কোনও রূপকেই স্বীকার করার অঙ্গীকার করছি এবং সেই সংবিধানের অন্তর্গত ভারত সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কোনও বিষয় ‘বিলয় পত্র’-এ নেই।

৮. এই ‘বিলয় পত্র’-এ এমন কিছু নেই যা এই রাজ্যে বা এই রাজ্যের উপর আমার সার্বভৌম ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে।

৯. আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই রাজ্যের পক্ষ থেকে আমি এই বিলয় পত্র কার্যকর করছি এবং এই পত্রে আমার বা এই রাজ্যের শাসক হিসাবে কোনও ওয়ারিশন কিংবা উত্তরাধিকারীর উল্লেখও আমার অভিপ্রেত নয়।

২৬ অক্টোবর ’৪৭ তারিখে প্রেরিত পত্র। (মুল পত্রের ভাবানুবাদ। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই বিলয় পত্রের বক্তব্যকে পূর্ণরূপে স্বীকার করে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।)

৩৭০ ধারাই ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস

এস গুরুমূর্তি

আমাদের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমাদের নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর সময় এসেছে। এমন কি সে সব করতে গেলে এদেশে শাসনতন্ত্রের মূল আইনের ধারা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বিশেষ করে যেসব অংশ বিভিন্ন গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত, এইসব বিষয়গুলির হিসেব-নিকেশ নেওয়া প্রয়োজন।

সংবিধানের প্রধান দুষ্ট ক্ষত ৩৭০ নং ধারাটি যা 'বিশেষ মর্যাদার' দাবীর জোয়ারকে আইনসম্মত করার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। এমন কি পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী ও উৎকট তামিল দেশভক্তরাও তাদের জাতীয়তাবিরোধী দাবীর সমর্থনে সেই ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারাটিই উপস্থাপিত করে। সূচনায় ৩৭০ নং ধারাটি নিয়ে গণপরিষদের সমগ্র বিতর্কটি ১৩ ভল্যুমে রয়েছে, কিন্তু এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা মোটে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় স্থায়ী হয় আর মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুসলিম সদস্যের প্রতিবাদ

প্রখ্যাত সিভিল সার্ভেন্ট তামিলনাড়ুর শ্রীগোপালস্বামীর মুখ থেকে এর বেশীর ভাগ পাই। তিনি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। একজন মুসলিম সদস্য জম্মু-কাশ্মীরকে এই বিশেষ মর্যাদা দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এছাড়া প্রত্যেকেই সরকারী বক্তব্যের সমর্থন করেন। শাসনতন্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই আইনটির উপর বিতর্কের এটাই সংক্ষিপ্তসার।

৩৭০ ধারার জন্ম

যুদ্ধ বিরতির এক বৎসর পর ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাসে গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করে। অন্তর্ভুক্তির পর শীঘ্রই রাজনৈতিক দিক থেকে মহারাজা হরি সিং তাঁর গুরুত্ব হারালেন। সুতরাং পুত্র ডঃ করণ সিংকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে তিনি অবসর নিলেন। ফলে শেখ আবদুল্লাহ্ই রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি বনে গেলেন। গণপরিষদের পর্দার আড়ালে উভয় পক্ষের মধ্যে দরকষাকষির পর শেখ আবদুল্লাহ্র সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করা হলো।

এই ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতি হলো ৩৭০ ধারা। এটা আইন করে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হলো। বলা হলো ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার এইটি একমাত্র উপায়। ৬৩ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমাদের এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রূঢ়ভাবে প্রশ্ন

৩৭০ ধারা বাতিলের দাবীতে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫৩)।

করতে হচ্ছেঃ কিভাবে এই বন্দোবস্ত কার্যকরী হচ্ছে? সেই সময় ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরকে ঐক্যবদ্ধ করার যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা কি সত্যই কাজের মতো হয়েছে? এই প্রশ্নই আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

চার দফা

৩৭০ ধারাটি তার আইনগত সমস্ত জটিলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চার দফা নীতি নির্ধারণ করেছে।

প্রথমতঃ, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্যতম রাজ্য। দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসহ ভারতীয় কোনও শর্ত বা ধারাই কাশ্মীরের গণপরিষদের (যা গঠিত হতে যাচ্ছে) স্বীকৃতি ছাড়া ঐ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও আইন, এমন কি, সংবিধান অনুসারে যে সব বিষয়ে একমাত্র পার্লামেন্টেই আইন পাশ করার অধিকারী, সে সবও কাশ্মীর রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কাশ্মীরে প্রয়োগ করা চলবে না। চতুর্থতঃ, প্রেসিডেন্ট আদেশ জারি বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারেন যে ৩৭০ ধারার শর্তগুলো জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে রহিত হবে, কিন্তু রাজ্যের বিধান সভার অনুমোদন ছাড়া কোনও আদেশ জারি করা যাবে না।

৩৭০ ধারার একটি মাত্র ইতিবাচক দিক হলো এই যে এতে কাশ্মীরকে ভারতর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ১নং অর্টিক্‌ল্‌ বলছে যে, সংবিধানের ১নং সিডিউলে তালিকাভুক্ত রাজ্যগুলো (কাশ্মীর এর অন্যতম নথীভুক্ত রাজ্য) নিয়েই ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে। ৩৭০ ধারার মধ্যে এইটিই একমাত্র শর্ত যা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংবিধানের আর সব আইনই নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৫০ সনের ২৬ জানুয়ারী আইনে পরিণত ৩৭০ নং ধারাটির প্রত্যক্ষ ফল এটাই। অর্থাৎ সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান আমরা প্রবর্তন করলাম তার একটি মাত্র আইন জম্মু ও কাশ্মীরের বেলায় প্রযোজ্য। সংবিধানের অন্যান্য শর্তগুলোর কোনও কোনও অংশ অনুমোদন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে। জম্মু-কাশ্মীর সরকার অথবা গণপরিষদ রাজী হলে অপরাপর অংশ প্রয়োগ করা যাবে, এইরূপে যে শাসনতন্ত্র রচিত হলো তা নিজেই রাজ্যগুলোর একটিতে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে রইল। ফলতঃ ৩৭০ ধারা স্বয়ং সংবিধানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে অন্তত বোবা ও পঙ্গু করে দিল।

তবে কি ভারতভুক্তির সময়ে কাশ্মীরের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার অঙ্গ এই সর্বনাশা ধারাটি—'যা নাকি সংবিধানের কর্তৃত্বকেই গ্রাহ্য করে না'? মনে হয় উত্তরটি স্পষ্টতঃই নেতিবাচক। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি-সই করা দলিল অন্য রাজ্যের দলিলেরই অনুরূপ। তবে কি শেখ আবদুল্লাহ ও তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী নেহরুর মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দানের কোনও সন্ধি হয়েছিল পর্দার আড়ালে অথবা অন্তর্ভুক্তির পরে পীড়াপীড়ি করে তা আদায় করা হয়েছিল? ঠিক কি ঘটেছিল তা কেউ জানে না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল এবং তারই পরিণত রূপ ৩৭০ ধারা।

জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান

পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে কাশ্মীরের জন্য একটা গণপরিষদ গঠিত হল। রাজ্যের আলাদা নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, ভিন্ন পতাকা ও ভিন্ন সংবিধান নির্দিষ্ট হলো। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ করা গেল না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেনে

কাশ্মীরের পথেই মহম্মদ গজনী সতের বার ভারত আক্রমন করে। ইহাই ভারতের প্রবেশদ্বার। যারা ওই একপ্রস্থ ভূমি নিয়ন্ত্রন করে তারাই এই বিশাল দেশ নিয়ন্ত্রন করবে। সুতরাং এটা একটুকরো জমি মাত্র নয়। ইহা দেশের সংহতি ও জাতির অস্তিত্বের দিক থেকে আরও অধিক মহত্বপূর্ন।

অবাক হবেন যে ২১নং পরিচ্ছদের শিরোনামটি গোড়ায় যেমন করে আইনে পরিণত হয়েছিল তাতে সেটি ছিল সাময়িক ও কালক্রমে পরিবর্তনীয়। এই পরিচ্ছেদেরই রয়েছে ৩৭০ ধারা। এই ধারাটির ব্যবস্থাপক নেহেরু বলেছিলেন যে এটা ক্রমশঃ ক্ষয়িত হবে। শ্রীগোপালস্বামী আয়ার গণপরিষদে বিতর্কের সময় বলেছিলেন যে ভারতের সঙ্গে পূর্ণ সংহতির জন্য এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। কিন্তু কালক্রমে ইহা ঐক্যবদ্ধ হবে এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হবে। ১৯৬৩ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করলেন যে ৩৭০ ধারা কার্যত মিলিয়ে যাবে। সেই থেকে কয়েক দশক কেটে গেছে প্রধানমন্ত্রীর কথামতো ৩৭০ ধারা ক্ষয়ও পেল না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা মতো উবেও গেল না। বরং এখন দু-একটি দল ছাড়া প্রত্যেকটি দলই ঘোষণা করছে যে ৩৭০ ধারা সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ সংবিধান বলছে ওটা অস্থায়ী ও পরিবর্তনীয়। কংগ্রেস থেকে ডি. এম. কে. এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে করুণানিধি পর্যন্ত প্রত্যেকে বলেন যে ইহা সংবিধানের চিরস্থায়ী অংশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী বলে (এই ছুতোয়) তখন যাকে নিছক সহ্য করা হয়েছিল, তাই এখন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩৭০ ধারার সমর্থনকারীরাই আজ সেক্যুলার আর এর বিরোধী যারা তারা হলো সাম্প্রদায়িক। যা ছিল সর্বজনস্বীকৃত অবৈধ তা হল বৈধ।

এবার বিচার করা যাক ৩৭০ ধারা সাময়িক ও অন্তবর্তীকালীন কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে থাকা উচিত কি না। যে নেতৃত্ব এই ধারাটি সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন তাঁরা যদি দেখাতে পারতেন যে এই ধারার ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীর দেশের বাকী অংশের সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং কেউ জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভূক্তি নিয়ে কোন প্রশ্ন করবে না, তবে অন্য যে কোন বিবেচনার কথা বাদ দিলেও ৩৭০ ধারাকে যথার্থ বলা যেত। যদি জম্মু-কাশ্মীর দেশের সঙ্গে মিলে মিশে যেত তবে ৩৭০ ধারাটি ন্যায্য কিনা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক কিনা, সংবিধানের তরফ থেকে যুক্তি-যুক্ত কিনা এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হোত। কিন্তু এটা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে ভারতের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছে কি? তারা ভারতের বাইরেই থেকে গিয়েছে। এই কাশ্মীরকে ফিরে পেতেই হবে। যারা এই ৩৭০-কে সমর্থন করে তারাও ভালভাবেই জানে যে এই মানসিকতার জোরেই কাশ্মীর ফিরে পাওয়া যাবে।

সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ

কিন্তু ৩৭০ ধারার পরিণতি কি? এটা আরো বেশী তোষণ ও ছাড় দেওয়ার দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এই সুবাদে আরো আটটি ধারা যুক্ত হয়েছে (Article 370 A to 370 G)। সেগুলো একই ধরণের। বিশেষ অঞ্চ ল বা রাজ্যকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এর সাহায্যে। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে এটা সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণের একটা দলিল এবং তা সত্ত্বেও ইহা তোষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

৩৭০ ধারার ভিত্তি ছাড়া যদি কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে না মিলিত হোত, আমাদের তাহলে কাশ্মীরকে জাহান্নামে যেতে বলা উচিত ছিল। মহারাজা হরি সিং ও শেখ আবদুল্লাই পাকবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেন। ইহাই কেবল আমাদের পথ দেখে নিতে সাহায্য করতে পারত। তথাপি আমরা শেখকে তার পথে যেতে দিয়েছি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন কখনো ঘটে না। এবং ভারতের বেলায়ও এরকম হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক আছে যারা অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের আঞ্চ লিক সংস্কৃতি জনসংখ্যাগত চরিত্রকে অবশিষ্ট ভারতের উপনিবেশীকরণের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য রচিত হয়েছিল। পরিষ্কার কথায় এই বোঝায় যে কাশ্মীর সর্বদাই মুসলিম প্রধান থাকবে এবং ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে কাশ্মীরে স্থানান্তরিত লোকের দ্বারা কাশ্মীরিরা (মুসলমানরা) সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে না। গত ৪২ বৎসরে অসমের আটটি জেলা জনসংখ্যাগতভাবে অনসমীয় অঞ্চ লে পরিণত হয়েছে। ভারতের অপর স্থান থেকে আগত লোকেদের জন্য তা অনসমীয় হয়েছে তা নয়, হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের দ্বারা। যখন অসমীয়াগণ বিদ্রোহ করল এবং অনুপ্রবেশের বিপদ থেকে নিরাপত্তা চাইল তখন এই ৩৭০ ধারার protagonist-রাই ওই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিল। আট বৎসর ধরে এই বিক্ষোভকে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়া হয়েছিল। তাই আজ জিজ্ঞাসা এই নয় যে ৩৭০ ধারা ন্যায্য বা অন্যায্য কি না—রাজনীতিগত কারণে ভুল না সঠিক অথবা সংবিধান অনুসারে ন্যায়সঙ্গত কি না। প্রশ্ন হলো ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের শেখ, শাহ্, মুফ্তীরা কাশ্মীরী পণ্ডিত ও বাইরের অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করবে বলে যে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা ফলপ্রসূ হয়েছে কি না। পরিচ্ছন্ন উত্তর—'না'। উল্টে ওই আইনটি বার বার বিশেষ মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কাশ্মীরের মুসলিমদের আরও বিভেদপরায়ণ করে তুলেছে।

ভারতের প্রবেশদ্বার

V. P. Menon লিখেছিলেন, যে-দেশ তার ভূগোল ইতিহাস স্মরণ করে না, এরকম আচরণ সে নিজের বিনাশকালে করে থাকে। তিনি তিনটি বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে ২৫ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেলের হয়ে যখন তিনি মহারাজা হরি সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন হরি সিং ভারতভুক্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমেনন ভারত সরকারকে তা অবহিত করান এবং সুপারিশ করেন যে হরি সিংহের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। সর্দার প্যাটেল তাঁকে সমর্থন করলেন, কিন্তু নেহেরু বিরোধিতা করলেন। শ্রী মেনন বলেন, এই কাশ্মীরের পথেই মহম্মদ গজনী সতের বার ভারত আক্রমণ করে। ইহাই ভারতের প্রবেশদ্বার। যারা ওই একপ্রস্থ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই এই বিশাল দেশ নিয়ন্ত্রণ করবে।

সুতরাং এটা এক টুকরো জমি মাত্র নয়। ইহা দেশের সংহতি, সামরিক ও জাতির অস্তিত্বের দিক থেকে আরও অধিক মহত্বপূর্ণ।

আমাদের বর্তমান শাসনকর্তারা ও তাদের বিরোধীরা কি মেননের উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করবেন? কাশ্মীর ভারতের প্রবেশ পথ বলেই দেশের মহানিরাপত্তামূল্য এতে রয়েছে। ১৯৪৭, '৬৫, '৭১ সালের যুদ্ধে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যোদ্ধা দের রক্তপাতের বিনিময়ে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সম্পন্ন ও রক্ষিত হয়েছে। নাছোড়বান্দার মতো আমরা যেন অতীত মিথ্যার পুনরাবৃত্তি না করে স্পষ্টবাদী হতে আরম্ভ করি।

এর প্রথম পদক্ষেপটি হলো সংবিধানের ৩৭০ ধারাটি প্রত্যাহার ও বাতিল করা।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও স্তম্ভলেখক)

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত

স্বশাসনের কথা বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতা : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর সর্বভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠকে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে জম্মু-কাশ্মীর সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হলো।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল কাশ্মীর উপত্যকায় হিংসাত্মক পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করছে। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার কাশ্মীর উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার মতো ভুল আবারও করে চলেছে। সব থেকে চিন্তাজনক হলো 'কাশ্মীর সমস্যা' বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দোলাচল-মনোবৃত্তি। এখনকার মতো আগে কখনও কেন্দ্র সরকারকে এরকম শিশু-সুলভ পদক্ষেপ, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক বুদ্ধি জীবীদের দেশবিরোধী প্রচার অভিযান তথা কাশ্মীর সমস্যাকে অনাবশ্যকভাবে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে এতটা দুর্বল এবং প্রভাবহীন দেখা যায়নি। দেশদ্রোহমূলক রাষ্ট্রঘাতী ভাষণ দেওয়া চলছে বিনা বাধায় সরকারের নাকের ডগায়।

আর এস এস-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডল সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে, গিলগিট, বালটিস্তান, মুজফঃরাবাদ, মীরপুর এবং আকসাই-চীন সহ সম্পূর্ণ কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারতভুক্তি (ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত) অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। যেদিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিং জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন আর তাতে সীলমোহর লাগিয়েছিলেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন। পঞ্চ াশের দশকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নির্বাচন সুসম্পন্ন হওয়াতে তাতে জনাদেশের সীলমোহরের ছাপও পড়ে যায়। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী- শেখ আব্দুল্লা সমঝোতার ফলে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বিষয়ে সবরকম বিবাদ চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল একথা আবারও বলে দিতে চায় যে, জম্মু-কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিভাজ্য অঙ্গ। তথাকথিত 'আজাদী' (স্বাধীনতা) বা জনমত সংগ্রহের দাবী দেশদ্রোহিতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নয়। কাশ্মীরের 'আজাদী' পাকিস্তান সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ইসলামি কট্টরপন্থীদের এক চাল মাত্র।

সঙেঘর কার্যকরী মণ্ডল জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে— যেখানে তিনি বলেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীর কখনও পরিপূর্ণভাবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি'। নিজের অপরিপক্কতা এবং দুর্বলতার ফলে তিনি রাজ্যকে হিংসার দাবানলের আগুনে নিক্ষেপ করেছেন। ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি হিংসাত্মক ঘটনাকে কঠোরভাবে দমন করার পরিবর্তে তা ছড়াতে সুযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যের মাধ্যমেও নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বাতাবরণ নির্মাণের কাজ করেছেন। আবার মাঝে মধ্যে গলা চড়িয়েছেন সেই ভাষায়— যে সকল কথা কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকদের উস্কানিতে ব্যক্ত করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্র সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করার বদলে সমর্থন করছেন বলে দেখা যাচ্ছে। এরফলে দেশের অখণ্ডতার পরিবর্তে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি র খেলাটাই ধরা পড়ছে। কার্যকরী মণ্ডল এসব কর্মকাণ্ড দেখে অবাক—বিস্মিত, স্তব্ধ।

সঙেঘর অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছে, কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশভক্ত ভারতবাসীকে উপত্যকার মূল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। অপরপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরকেই উপত্যকার প্রতিনিধি হিসাবে

জম্মু-কাশ্মীর এমন একটি সংবেদনশীল রাজ্য, যেখানে পূর্ব নিয়োজিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত চলে আসছে। যে কারণে সেখানে সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতি সতত এবং অনিবার্য বলেই পরিগণিত। এ কারণে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর পর্যাপ্ত অধিকার থাকা উচিত এবং 'সশস্ত্র বাহিনী বিশেষাধিকার আইন' সেইরকম এক ব্যবস্থা মাত্র। অতএব তাকে প্রত্যাহার করা চলে না।

মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। ওই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন —দেশভক্ত মুসলমান, কাশ্মীরী পণ্ডিত, শিখ, শিয়া, পার্বত্য লাদাখের বৌদ্ধ সম্প্রদায়, রাজ্যের গুজ্জর এবং বাখরবাল সম্প্রদায়। এছাড়াও রয়েছেন কয়েক লক্ষ বিতাড়িত উদ্বাস্তু পণ্ডিত— যাদেরকে স্বাধীনতার ৬০ বছর বাদেও দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। এবং আছেন জম্মুর অধিবাসীরা। কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে বলতে চায়, সরকার যেন জম্মু-কাশ্মীরের সেই সকল অধিবাসী এবং বিশেষত কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং পাক-দখলীকৃত কাশ্মীর থেকে আগত শরণার্থীদের সঙ্গেও কথা বলেন। ওই সকল কাশ্মীরবাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং উগ্রপন্থীদের শতসহস্র অত্যাচার সহ্য করার পরও ভারতবর্ষের অন্তর্গত ও অনুগত হয়েই থাকতে চান। কিন্তু ওই সকল ভারতবাসীদের দেখে একথাই মনে হয় যে, সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের-ই গুরুত্ব দিয়েছেন আর তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন।

কার্যকরী মণ্ডল তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করছে, কেননা সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে— সর্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের কাশ্মীর সফরের সময়ে যে সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মান্যতা দেওয়ার দরকার ছিল না তাদেরকেই দারুণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর ভারত-সমর্থক দেশভক্ত নাগরিকদের কথা শোনার মতো সময় বা দৃষ্টিকোণ ওই প্রতিনিধিদের ছিল না।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বিগত কুড়ি বছরে দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর বীরত্বব্যঞ্জক প্রয়াসের ফলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের পায়ের তলার মাটি আলগা হয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় ৫০০০ নিরাপত্তারক্ষী সঙ্ঘর্ষে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। তারপর আজও নিরাপত্তারক্ষীরা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদেরকে সমর্থন করার পরিবর্তে দেশের সরকার, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদ মাধ্যমের একাংশ তাদেরকে 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিহীন অভিযোগের নামে প্রতিরক্ষা-বাহিনীর মনোবল ভাঙার অপপ্রয়াসকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল তীব্র ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের ভুললে চলবে না, যে ধরনের সন্ত্রাসের সাহায্য এসময়ে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিচ্ছে তা সন্ত্রাসবাদীদের পরিবর্তিত রণনীতির অঙ্গ এবং শুরু থেকেই রয়েছে। তা সে ১৯৪৭-৪৮-এর কবাইলী (জনজাতি) হামলা, ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯-এর প্রত্যক্ষ পাক-আক্রমণ

অথবা নববই -এর দশকের সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে ছদ্মযুদ্ধ (প্রক্সি ওয়ার), অথবা এখনকার পাথর-ছোঁড়া সন্ত্রাসীস্বরূপ— সকলই প্রতিবেশী দেশের কাশ্মীর-উপত্যকা তথা ভারতব্যাপী সন্ত্রাসের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ মাত্র। বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকায় পাথর ছুঁড়ে ৩০০-এর বেশি নিরাপত্তারক্ষীকে ঘায়েল করা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি অনেক মারাত্মক। সন্ত্রাসের মুখে সুপরিকল্পিতভাবে নির্দোষ বালক-বালিকাদের সামনের সারিতে এগিয়ে দিয়ে তাদেরকে 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন করছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সশস্ত্র সৈন্যদের জন্য যে বিশেষাধিকার রয়েছে তাকে তুলে দেওয়ার যে দাবী ওঠানো হচ্ছে, তাকে দেশের পক্ষে ভয়াবহ পরিণামকারী বলে মনে করে। জম্মু-কাশ্মীর এমন একটি সংবেদনশীল রাজ্য, যেখানে পূর্ব নিয়োজিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত চলে আসছে। যে কারণে সেখানে সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতি সতত এবং অনিবার্য বলেই পরিগণিত। এ কারণে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তাবাহিনীর পর্যাপ্ত অধিকার থাকা উচিৎ এবং 'সশস্ত্র বাহিনী বিশেষাধিকার আইন' সেইরকম এক ব্যবস্থা মাত্র। অতএব তাকে প্রত্যাহার করা চলে না। একদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রসন্ন করতে সেনাবাহিনীর বিশেষাধিকার তুলে দিতে একপায়ে খাড়া, অপরদিকে সেনাপ্রধান নিজেই এই অপচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতাকারী দলের সেইসব বক্তব্য এবং কার্যকলাপকেও কার্যকরী মণ্ডল কঠোর নিন্দা করছে যার দ্বারা মধ্যস্থতাকারীদের মনোভাব স্পষ্টই বোঝা যায়। মধ্যস্থতাকারীদের বেশ কিছু বক্তব্যে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত কাশ্মীর বিষয়ক প্রস্তাব-১৯৯৪-এর পরিষ্কার বিরোধিতা বা উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই মধ্যস্থতাকারীদের না রয়েছে স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, না আছে বিশেষজ্ঞতা এবং আইনগত মান্যতা। সংসদ স্বীকৃত বা জনাদেশও (জনগণের অনুমোদন) ওই মধ্যস্থতাকারীদের নেই। ওরা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে কাজ করছেন, যার ফলে জাতির (রাষ্ট্রের) সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। কাশ্মীরের মতো একটি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্র সরকার যাদের আগে থেকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ রয়েছে তাদেরকে মনোনীত করেছেন। এটা সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। কার্যকরী মণ্ডল ওই সকল দৃষ্টিকোণের কঠোর নিন্দা করে মধ্যস্থতাকারী দলকে ভেঙে দেওয়ার দাবী জানাচ্ছে।

কার্যকরী মণ্ডলের সুস্পষ্ট অভিমত হলো সরকার বিদেশীদের চাপে নত হয়ে কাশ্মীর উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে পরিবেশ তৈরি করছে। অনেক মন্ত্রীদের জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ওকালতি মাত্র। এরকম এক পরিস্থিতি তৈরির জন্য সর্বদলীয় প্রতিনিধি মণ্ডল, মধ্যস্থতাকারী দল কতিপয় রাজনৈতিক দলের কিছু ব্যক্তিবর্গকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল বার বার মনে করিয়ে দিতে চায় যে, কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানে সংবিধানের ইঙ্গিতবহ নির্দেশ এবং ১৯৯৪ সালে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীরের পরিপূর্ণ ভারতভুক্তি অভিব্যক্ত ও স্বীকৃত হওয়া উচিৎ। স্বায়ত্বশাসন অথবা ১৯৫৩ সালের পূর্বেকার অবস্থায় ফেরানো কখনই নয়।

সঙ্ঘের কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে সাবধান করে দিতে চায় যে, জম্মু-কাশ্মীরকে পুনরায় টুকরো করার প্রয়াস হলে দেশভক্ত নাগরিকদের সঙ্গে সকল ভারতবাসীই তীব্র প্রতিরোধ করবে। একই সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাচ্ছে— সকল মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা যেন সুনিশ্চিত করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষাই সর্বাগ্রগণ্য। তাকে উপেক্ষা করে কোনওরকম সমঝোতা যেন না করা হয়। একই সঙ্গে কার্যকরী মণ্ডল সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, সকলে যেন জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং স্বায়ত্ত্বতার নামে দেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার যাবতীয় কুৎসিৎ অপপ্রয়াসকে বুঝে তাকে সফল হতে না দেন। 'স্বায়ত্ত্বতা' দেশেকে আরও একবার ভাগ করার পটভূমি সৃষ্টি করার অপর নাম, এটা দেশবাসী কখনও স্বীকার করবে না।

একনজরে
জম্মু-কাশ্মীর ঃ পক্ষপাতিত্বের নজির

বিষয়	কাশ্মীর	জম্মু
আয়তন	১৫৯৪৮ বর্গ কিমি	২৬২৯৩ বর্গ কিমি
আমদানী	২০% থেকে কম	৭৫% চেয়েও বেশী
ভোটদাতা (২০০২)	২৮,০৮,৩৯৫	৩০,৫৯,৯৮৬
বিধানসভা আসন	৪৬	৩৭
প্রতি আসনে ভোটদাতা	৪৯.৭২৩	৬৬,৫২১
প্রতি আসনের এলাকা	৩৪৬.৬ বর্গ কিমি	৭১০.৬ বর্গ কিমি
লোকসভা আসন	৩	২
প্রতি লোকসভা আসনে ভোটদাতা	৯,৬১,৩১৮	১৫,২৯,৯৯৩
কেবিনেট মন্ত্রী	বেশী	কম
জেলা	১০	১০
প্রতি জেলা ক্ষেত্রফল	১.৫৯৪ বর্গ কিমি	২.৬২৯ বর্গ কিমি
এক মহকুমা জেলা	২	নেই
বেকারের সংখ্যা (শতকরা)	২৯.৩০%	৬৯.৭০%
সচিবালয়ের অংশীদারী	৭৫% উপর	২০% থেকে কম
কাশ্মীরী কর্মচারী	৯৯% বেশী	২৫% থেকে কম
গৃহবাসী রোজগেরে	১% থেকে কম	৭৫% থেকে কম
পি. এইচ. ই-তে কর্মচারীর প্রাপ্য	২১০০ টাকা	৫০০ টাকা
রাজ্য দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩০৪ মেগাওয়াট	২২ মেগাওয়াট
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ	১০০%	৭০% থেকে কম
রাস্তা লম্বায়	৭১.২৯ কিমি	৪৫.৭১ কিমি
রাস্তা চওড়ায়	৫১.৭%	২৩.১%
পর্যটন ব্যয়	৮৫% থেকে উপর	১০% থেকে কম
বিভিন্ন দপ্তরের মুখ্যালয়	১২	নেই
পাবলিক সেক্টর প্রতিশ্রুতি	৩	নেই
কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়	৭০% থেকে বেশী	৩০% থেকে কম
রেশম উদ্যোগে ব্যয়	৭০% থেকে বেশী	৩০% থেকে কম
সেচে ব্যয়	৬১% থেকে বেশী	৩৫% থেকে কম
শহর বিজনেসে ব্যয়	৭০% থেকে বেশী	২৫% থেকে কম

সরকারী তথ্য (২০০৬-২০০৭) অনুযায়ী।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাশ্মীর সমস্যা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

নানা কারণে কাশ্মীর নিয়ে জটিলতা আবার বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আবার নরম নীতি নিয়েছেন কিনা—এই প্রশ্নটাও উঠে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। এটা লক্ষণীয় যে, এই সমস্যার সমাধান-সূত্র খোঁজার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পর্যবেক্ষক-দলকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ অদ্ভুত ও উদ্ভট প্রস্তাব দিয়েছেন সাম্প্রতিক সাংবাদিক-সম্মেলনে। দলের অন্যতম প্রতিনিধি দিলীপ পদ্‌গাঁওকার এর আগে বলেছিলেন, এই ব্যাপারে পাকিস্তানকেও যুক্ত করতে হবে। এই নিয়ে তখনই তীব্র আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু তার পরেও আরেক সদস্য রাধাকুমার বলেছেন—পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের সময় আলোচনাটা যে জায়গায় পৌঁছেছিল, সেখান থেকেই আবার শুরু করা দরকার।

সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য ছিল—কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি একটা চূড়ান্ত ব্যাপার এবং কাশ্মীর ভারতের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই জিজ্ঞাসা, তারই পর্যবেক্ষক-দলের সদস্যরা কেমন করে এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করেন? এই পর্যবেক্ষকদের গুণগত মান বা পরিচয় আমরা জানি না। সংসদ বা দেশের মানুষের আস্থা তাঁদের প্রতি কতটা আছে—সেটা নিয়েও আমরা কিছু বলতে পারব না। কিন্তু ইতিহাস, আন্তর্জাতিক আইন, বাস্তববোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি ব্যাপারে যে তাঁরা অজ্ঞ—সেই নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কিছু কথাবার্তাও স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের কারণে। কোনও কোনও সময় তিনিও সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানের একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

অনেক বুদ্ধি জীবীও এই নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। যেমন, লেখিকা অরুন্ধতী রায় কাশ্মীরের 'স্বাধীনতা' দাবি করেছেন। একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক গিলানীও।

কাশ্মীরের রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গোষ্ঠী তুলেছেন ভিন্ন ভিন্ন দাবি। এটা লক্ষণীয় যে, ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স্ চায় পৃথক সংবিধান, আলাদা প্রধানমন্ত্রী, পৃথক সুপ্রীম কোর্ট ইত্যাদি—অর্থাৎ স্বায়ত্বশাসন এবং সঙ্গে প্রাক্-১৯৫৩ অবস্থান। পিপল্‌স্' ডেমোক্র্যাটিক

জঙ্গিদের হাত থেকে নিস্তার নেই নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িও।

পার্টির লক্ষ্য হলো স্বাধীনতার কাছাকাছি এক ধরণের স্বায়ত্বশাসন। আবার হুরিয়ৎ কন্‌ফারেন্স ইত্যাদির দাবি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। অধ্যাপক গিলানী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরাও এটা চান। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দরকার গণভোট বা 'plebiscite'। অথচ কারও কারও মতে, এর চেয়ে প্রয়োজন পাকিস্তানের সঙ্গেও একটা সমঝোতা।

এঁদের কিন্তু কিছু পুরনো কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা', 'স্বায়ত্বশাসন', 'পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা' ইত্যাদির প্রশ্নই উঠতে পারে না। মনে রাখতে হবে—১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় 'বৃটিশ-ভারত' ও 'প্রিন্সলী স্টেট্‌স্'—এই দুটো অংশ হিসেবে দেশটাকে ধরা হোত। প্রথমটা ছিল বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। আর প্রিন্স্‌লী স্টেটস্ বলতে বোঝাত ৫৬২টা দেশীয় রাজ্যকে—তার কোনটাতে ছিলেন রাজা, কোনটাতে নবাব। তাঁরা অনেকটা স্বাধীন ভাবেই চলতেন।

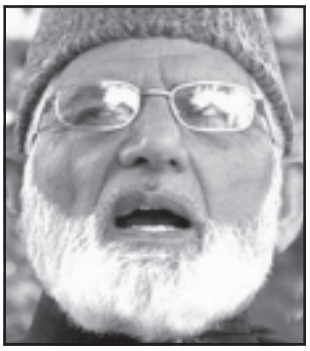

দুই গিলানি — সৈয়দ আলি শাহ গিলানি এবং এস এ আর গিলানি।

বৃটিশ-সরকার তাঁর 'প্যারামাউন্ট্‌সী' তুলে নিয়ে এই দেশীয় রাজ্যগুলোর অবস্থান কেমন হবে—এই প্রশ্নটা উঠে পড়ায় 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' (১৯৪৭)-দ্বারা ঠিক হয়েছিল—তারা 'ইন্স্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেসন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, ইচ্ছে করলে অবশ্য তারা স্বাধীনও থাকতে পারবে আগের মতো। ডঃ বি. সি. রাউত মন্তব্য করেছেন, 'They would be free to accede to India or Pakistan or may prefer to remain free'—(ডেমোক্রেটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৫১)। সেই আইন অনুসারে অধিকাংশ রাজ্যই যোগ দিয়েছে ভারতে, অল্প কিছু রাজ্য যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে।

মুসলীম অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং কিন্তু চেয়েছিলেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সেই জন্য বড়লাট মাউন্টব্যাটেন তাঁকে ভারতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানাতে গেলে তিনি বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দেখা করেননি। (লিওনার্ড মস্‌লে—দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজ, পৃঃ ২১২)।

কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে নিয়ে গেছে অন্য দিকে। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী কাশ্মীর দখলের জন্য অভিযান চালালে মহারাজা বিপন্ন হয়ে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজন দিল্লি এসে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা নিজের ইন্স্ট্রুমেন্টে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর না দিলে নেহরুর কিছু করার ছিল না। সেই সময় কাশ্মীরের প্রধান নেতা শেখ আবদুল্লা পাশের ঘরেই বসেছিলেন। তিনিও নেহ্‌রুকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর মেহেরচাঁদ মহাজন বিশেষ বিমানে কাশ্মীরে গিয়ে ইন্স্ট্রুমেন্টে হরি সিংয়ের স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। ডঃ বিদ্যাধর মহাজন লিখেছেন, 'V.P. Menon then went to kashmir accompanied by Mahajan and after getting the Instrument of Accession Signed from Hari Singh, they flew back to India'—(দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৪২)। ২৭ অক্টোবরেই কাশ্মীরের এই ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল এবং তার ফলেই ভারতীয় বাহিনী গিয়েছিল কাশ্মীরকে পাক্-কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য। সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল মহারাজের সম্মানের বিনিময়েই। ডব্‌লিউ. এইচ. মরিস জোন্স্ মন্তব্য করেছেন, 'This was given only on this ruler's agreeing that Kashmir should to India'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স,পৃঃ ১৬)।

সুতরাং কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের কাছে হরি সিংয়ের চিঠির (২৬.১০.৪৭) একটা অংশে ছিল—"With the conditions obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have us option but to ask for the help from the Indian Dominion"—(উদ্ধৃত, স্বদেশ সিং—কাশ্মীর, পৃঃ ৬৭)। এটা তো ঐতিহাসিক দলিল।

এক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমঝোতার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে—সেই দেশ তো কাশ্মীরে পাঠিয়েছিল হানাদার। তার সঙ্গে হরি সিংয়ের কোনও চুক্তি কি হয়েছিল? ভারতীয় বাহিনী হানাদারদের প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল—সেনাধ্যক্ষ আর কয়েকটা দিন সময় চেয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলও সেটা চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুর ভুলে সেটা হয়নি—(বিষ্ণু প্রভাকর—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃঃ ৭১)। সেই জন্যই এই ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও বৈঠকের দরকারই নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টা স্বায়ত্বশাসন নিয়ে। শব্দটা দ্বারা আন্দোলনকারীরা কি বোঝাতে চাইছেন? আমাদের সংবিধানে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদটা রয়েছে—এর ফলে কাশ্মীর পেয়েছে পৃথক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধে। দুর্গাদাস বসু লিখেছেন,'The state of Jammu and Kashmir holds a peculiar position under the constitution of India'—(অ্যান্ ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২২) বলা বাহুল্য, এই ধরনের মর্যাদা অন্য কোনও অঙ্গ-রাজ্যই পায় না। কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগমোহন তাই মন্তব্য করেছেন, 'Jammu and Kashmir already enjoys, albeit unjusticiately, for more powers than are available to other states of the union'—(উদ্ধৃত, স্বদেশ সিং, ওই, পৃঃ ৭১)।

এবার গণভোটের কথা বলি। এই দাবিটা রাষ্ট্রসঙ্ঘে উঠেছিল পাকিস্তান, আমেরিকা প্রভৃতির ভারত-বিরোধী চক্রান্তের ফলে। অবশ্য এক সময় নেহরুও এই প্রস্তাবটি তুলেছিলেন। এটা ছিল তাঁর পর্বত-প্রমাণ ভুল—ভি. এন. খান্নার ভাষায়—'The decision of Nehru to offer a plebiscite to accertain the wishes of the people, was a serious mistake'—(ফরেন পলিসি অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৭০)। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, কাশ্মীরের সঙ্গে চুক্তিতে (অর্থাৎ 'ইন্স্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেসন' ও 'স্ট্যাণ্ডস্টীল অ্যাগ্রিমেন্ট') এই ধরণের কিছু আদৌ ছিল না। আবার দুর্গাদাস বসুর কথা বলি—'The Instrument of Accession signed by maharaja Hari Sing on the 26th Oct., 1947, was in the same form as was executed by the Rulers of the numerous other states which had acceeded to India'—(ওই, পৃঃ ২২৯)। অন্যান্য রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে যেমন প্রজাদের গণভোটের প্রশ্নটা ছিল না, কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও না। তাহলে গণভোট হবে কিসের ভিত্তিতে ও কোন্ আইন অনুসারে? সেখানে মুসলীমরা গরিষ্ঠ হলেও আছেন বহু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, শিয়া, গুজ্জর ও বাখরবাল সম্প্রদায়। গণভোটে গরিষ্ঠরা পাকিস্তানে যেতে চাইলে এই মানুষগুলো কি করবেন? তাঁরা তাহলে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসবেন, কাশ্মীরের কয়েক লক্ষ পণ্ডিতের মতো? ছাড়বেন পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি?

লীগ-নেতা জিন্না বলতেন, কংগ্রেস রাজত্বে মুসলমানরা অত্যাচারিত হবেন, পরিণত হবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। কিন্তু ভারতের হিন্দু-গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কাশ্মীরে কি মুসলমানদের বঞ্চিত করা হয়েছে? হিসেবে দেখছি—জমির ১৭.৪ শতাংশ তাঁদের, আর ২.৬ শতাংশ হিন্দুদের। ফলবাগানের ৯৬ শতাংশ আছে তাঁদের হাতে। বাগিচার কাজে হিন্দুদের মধ্যে নিযুক্ত আছেন মাত্র ০.৫ শতাংশ। শিল্প ক্ষেত্রেও হিন্দু আছেন .০২ শতাংশ। হস্তশিল্পে চাকরি পেয়েছেন ০.৪ শতাংশ হিন্দু-কর্মী। পরিবহন-ব্যবস্থাতেও তাঁদের স্থান ৪.২ শতাংশ।

আরও বড় কথা হলো—গরিষ্ঠদের মন জয়ের জন্য প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার অবিশ্বাস্য কম দামে খাদ্যদ্রব্য যোগান দিয়ে চলেছেন। রাজ্য বাজেটের ৭৪ শতাংশ আসে কেন্দ্রের কাছ থেকেই।

তাহলে বঞ্চনাটা হলো কোথায়?

এবার হুরিয়ৎ প্রধান সৈয়দ আলী শাহ্ গিলানীর পাঁচ দফা দাবির প্রসঙ্গে আসি। তিনি চেয়েছেন—

১. কাশ্মীরকে বিতর্কিত রাজ্য বলে ঘোষণা করা হোক।

২. আর্মড্ ফোর্স (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট বাতিল করা হোক।

৩. কোনও গুলিবর্ষণ বা গ্রেপ্তার চলবে না।

৪. সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে (আফ্জল গুরু-সহ) মুক্ত করতে হবে; এবং

৫. অভিযুক্ত পুলিশ ও সেনাদের শাস্তি দিতে হবে।

বিষয়গুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক।

অরুন্ধতী রায়

"পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমঝোতার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? সেই দেশ তো কাশ্মীরে পাঠিয়েছিল হানাদার। তার সঙ্গে মহারাজা হরি সিংয়ের কোনও চুক্তি হয়েছিল কি?"

জঙ্গির হাতে আক্রান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান।

প্রথমত, কাশ্মীরকে বিতর্কিত অঞ্চ ল বলতে হবে কেন? তার ভারত-ভুক্তির ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ এক ঐতিহাসিক সত্য। হরি সিং ইন্সট্রুমেন্টেই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ঘরে ঘরে সেখানে বাল্যকাল থেকেই প্রত্যেককে 'জেহাদি' বানানো চলছে, দেওয়া হচ্ছে অস্ত্র, শিক্ষা, সেখানে শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া কি জরুরী নয়? কখনও মাইন-বিস্ফোরণ, কখনও প্রক্সি-যুদ্ধ, কখনও পাথর ছুঁড়ে রক্ষী হত্যা, কখনও গেরিলা আক্রমণ চলছে। একটা ছোট্ট হিসেব দিই—তাতে আছে হত্যার হিসেব—

সাল	নিরীহ নাগরিক	নিরাপত্তা-কর্মী
২০০১	৯৯৯	৫৩৬
২০০২	১০০৮	৪৫৩
২০০৩	৭৯৫	৩০৪
২০০৪	৭০৭	২৮১
২০০৫	৫৫৭	১৮৯
২০০৬	৩৮৯	১৫১

(সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-দপ্তর)

আরেকটা হিসেবে দেখছি—১৯৮৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৪৭,২৩৪ টা ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তাতে সাধারণ নাগরিকের মধ্যে প্রাণ দিয়েছেন ১৪,৫৯৫ জন ও রক্ষী ৫,৯৭৫ জন।

এর পরেও সন্ত্রাস-দমন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি তোলা যায়? সংখ্যালঘুরা তাহলে বাঁচবেন?

তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এরপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করবে না, এবং কাউকে গ্রেপ্তার করবে না। তার অর্থ হলো—সন্ত্রাস চলবে একতরফা ভাবে। কাশ্মীর 'মৃত্যু উপত্যকা' হয়ে আছে—কিন্তু গিলানীর দাবি—সেই মৃত্যুটা হবে শুধু হিন্দু-নাগরিক, পুলিশ ও সৈনিকদের?

চতুর্থত, গিলানীর দাবি—সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু বন্দীদের অধিকাংশই তো ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত—হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, দাঙ্গা, ভীতিপ্রদর্শন, দেশদ্রোহিতা—কোনওকিছুই তাহলে অপরাধ নয়? পার্লামেন্টের হত্যাকাণ্ডে আফ্‌জল গুরু ধৃত হয়েছে—তাকেও ছেড়ে দিতে হবে?

শেষের দাবিটা হলো—যে-সব পুলিশ ও সৈন্য অরাজকতা বন্ধের জন্য কাজ করেছেন, তাঁদের শাস্তি দিতে হবে। অবশ্য হয়তো কোথাও কোথাও বাড়াবাড়ি হয়েছে—সেগুলোর জন্য বেছে বেছে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কিন্তু পাইকারী হারে দেশরক্ষকদের শাস্তি দিতে হবে কোন্ নিয়মে?

সুতরাং এটা বোঝা যায় যে, একটা চক্র কাশ্মীরকে নিয়ে রাজনীতি করে চলেছে। কিছু নেতার স্বার্থ জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে, উৎসাহ দান করছে বিদেশী রাষ্ট্রও। আর কিছু তথাকথিত বুদ্ধি জীবী বাহবা কুড়নোর জন্য 'স্বাধীনতা' 'মানবাধিকার', 'স্বায়ত্বশাসন' ইত্যাদির কথা তুলে সৃষ্টি করে চলেছেন অপ্রয়োজনীয় জটিলতা। তাঁরা ইতিহাস পড়েননি, তাঁদের কাছে দলিল বা চুক্তির কোনও দাম নেই, তাঁদের কাছে জেহাদীর প্রাণের দাম আছে—কিন্তু অসহায় নাগরিক, পুলিশ বা সৈনিকের প্রাণটা প্রাণ নয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতাও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। তেমনি, কেন্দ্রীয় সরকারের হাবভাব ও তার প্রেরিত পরিদর্শকদের কথাবার্তাও নতুন করে বিপদের ইঙ্গিত বয়ে আনছে। কিন্তু তেষট্টি বছর কেটে গেছে—আর নয়। এবার ঠিক করতেই হবে—আমাদের নীতি কি হবে। শান্তিই হবে আমাদের আসল লক্ষ্য, কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইতিহাস, সত্য ও ন্যায়ের পথেই। আর অর্জন করতে হবে শক্তি—কারণ শান্তি শক্তিরই সংহত রূপ। পাকিস্তানের সঙ্গে কথার কোন দরকার নেই। সেই দিন এসেছিল ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে। ১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। ইজরায়েলী কায়দায় ভারতের উচিত ছিল তখন লাহোর দখলে রেখে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলা। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল লাখ-খানেক পাক্-সৈন্য। তাদের আটকে রেখেও কাশ্মীর নিয়ে বৈঠক করা যেত। তাহলে বন্ধ হোত 'ক্রশ-বর্ডার' সন্ত্রাস। কথা বলা চলে শুধু কাশ্মীরের নেতাদের সঙ্গে। কিন্তু তার ভিত্তি হবে ১৯৪৭ সালের সেই চুক্তি। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও কিছু ছাড়া যেতে পারে, সুযোগ-সুবিধে নেওয়া যেতে পারে শান্তির জন্য। শুধু মুস্‌লীম স্বার্থ নয়, দেখতে হবে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থও—কারণ যুগ-যুগ ধরে তাঁরাও সেখানকার অধিবাসী।

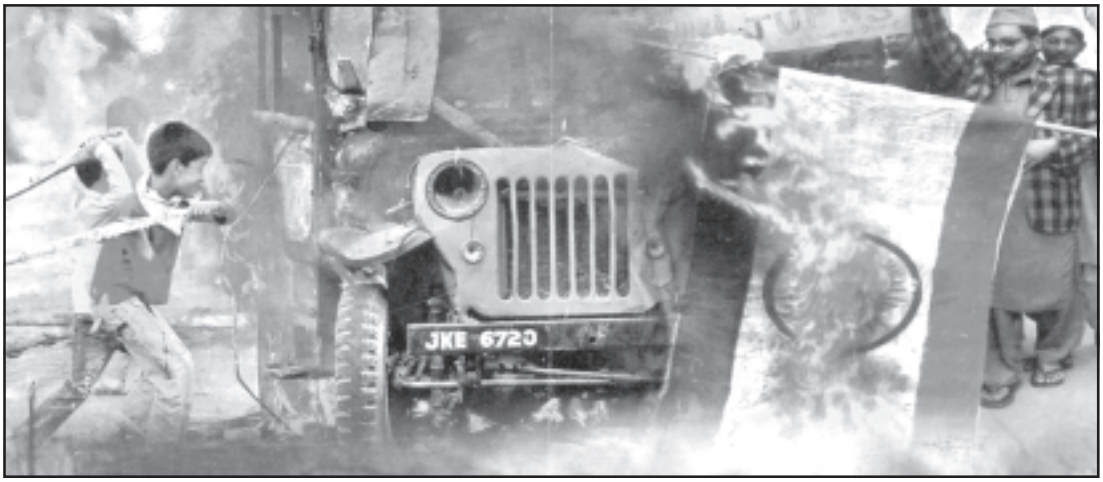

জঙ্গিস্থান কাশ্মীর

অর্ণব নাগ

ভারত সরকারের অপরিণামদর্শিতায় এবং মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ক্রমাগত আপস করে যাওয়ার হঠ্‌কারী মানসিকতায় ভারতবাসীর ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর বর্তমানে জেহাদী আর জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। আফজল গুরুকে ফাঁসি দিতে টালবাহানা করা, আজমল কাসভকে জেলে জামাই আদর করা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাশ্মীরে পাঠানো সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতাদের (একমাত্র ব্যতিক্রম বিজেপি) কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূ-স্বর্গে জঙ্গি দমনের ব্যাপারে মানসিক দৈন্যতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। আর যার সুযোগ নিয়ে অরুন্ধতী রায়, সৈয়দ আলি শাহ গিলানী, এস এ আর গিলানীরা ভারতের বুকে বসে ভারতেরই দাড়ি ওপরানোর যাবতীয় স্পর্ধা দেখাতে পেরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে জঙ্গিদের সাম্প্রতিক কিছু খবরা-খবর সরবরাহের চেষ্টা করা হলো।

কাশ্মীরে জঙ্গি গোষ্ঠীসমূহ

বিগত দু'বছর যাবৎ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে কাশ্মীরে তাদের জঙ্গি-কার্যকলাপে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওই গোষ্ঠীদুটির নাম—আল মানসুরিন এবং আল নাসিরিন। এর পাশাপাশি কাশ্মীর উপত্যকায় জেহাদী আন্দোলনকে আরও ব্যাপক আকারে জড়িয়ে দিতে ইদানীংকালে 'সেভ কাশ্মীর মুভমেন্ট'-এর সূচনা হয়েছে। এর কার্যকলাপ ভারতের মুজফঃরাবাদ এবং জঙ্গি দৃষ্টিকোণ থেকে 'আজাদ কাশ্মীর-এ' নিয়ন্ত্রণ করছে হরকত -উল-মুজাহিদিন (পূর্বতন হরকত-উল-আনসার)। পাকিস্তানে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এর কাজকর্ম চালায় লস্কর। এরা ছাড়াও ফারজানদান-এ-মিলাত জঙ্গি গোষ্ঠীও এই মুহূর্তে সেখানে বেশ সক্রিয়। আল-বদরের মতো জঙ্গিগোষ্ঠী আকারে ও প্রকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও জেহাদী কার্যকলাপে বহুবছর ধরে সক্রিয় এবং সেই সক্রিয়তা এখনও বজায় রেখেছে। অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স, যাদের দৌত্যে নয়াদিল্লী বরাবর আস্থা রেখেছে আর ঠকেছে, কাশ্মীরের বুকে জেহাদী কার্যকলাপে মদতদানে তাদের নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও নেহাৎ কম নয়। তবে সাম্প্রতিক তথ্যের খাতিরে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, জয়েশ-এ-মহম্মদ এবং লস্কর-এ-তৈবার জঙ্গিরা এই কাউন্সিলের সদস্য। এই কাউন্সিলটি বহু বছর ধরেই কাশ্মীরের বুকে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করেছে। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ২০০১-এর ডিসেম্বরে দেশের সংসদভবন হামলার ঘটনায়

জঙ্গি নিশানায় ভারত।

জয়েশ ও লস্কর জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যরাই জড়িত ছিলেন এবং ওই বছরেরেই অক্টোবরে শ্রীনগরে যে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভা আক্রান্ত হয়েছিল তার পেছনে জয়েশ-ই-মহম্মদের জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। এই জয়েশ-ই কান্দাহারে ভারতীয় এয়ারলাইন্স বিমান (ফ্লাইট নং আই সি-৮১৪) অপহরণ কাণ্ডে জড়িত ছিল। তাদের নেতা মৌলানা মাসুদ আজহার-কে সেই বিমান অপহরণ কাণ্ড ঘটিয়ে ভারতের হাত থেকে উদ্ধার করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কাশ্মীরে জঙ্গি নাশকতা আরও বৃদ্ধি করার ওপর জোর দিয়েছিল জয়েশ। জয়েশ-এর লক্ষ্যই হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম যুবকদের যোগাড় করে এনে জেহাদীমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে তাদের প্রেরণ করা।

বৃহৎ জঙ্গি ঘাঁটি সমূহ

এখনও পর্যন্ত যে-সমস্ত বৃহৎ জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হলো ঃ

জঙ্গি ঘাঁটি	অবস্থান
মুরিদকী (লাহোরের নিকট)	পাঞ্জাব, পাকিস্তান
কোটলি	পাক-অধিকৃত কাশ্মীর
মুজঃফরাবাদ	পাক-অধিকৃত কাশ্মীর
স্কার্দু	উত্তর-অঞ্চ ল, পাকিস্তান
গুলতারি	উত্তর-অঞ্চ ল, পাকিস্তান
তারকুটি	উত্তর-অঞ্চ ল, পাকিস্তান
বাত্রাসি	উত্তর-পশ্চি ম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান
সুফিয়াদা	উত্তর-পশ্চি ম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান
তান্ডা আল্লাবায়ার	সিন্ধুপ্রদেশ, পাকিস্তান

বিঃ দ্রঃ—বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত সবকটি বড় জঙ্গিঘাঁটি-ই অবস্থিত পাকিস্তানে। পাক-সরকার এই তথ্যকে যতই অস্বীকার করুন না কেন একথা অনস্বীকার্য যে সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এই বৃহত্তম জঙ্গি ঘাঁটিগুলি এখনও বহাল তবিয়তে থাকতে পারতো না। সুতরাং আমেরিকার এবং কখনও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে পাকিস্তানের 'আন্তরিক' হওয়া যে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই তা মনে হয় পাঠকদের সামনে এতক্ষণে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি কার্যকলাপ

গত একদশকে কাশ্মীর উপত্যকায় কত অসংখ্য নিরীহ মানুষ যে সন্ত্রাসী হানার বলি হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও প্রকাশিত হয়নি। অন্ততঃ ৪ লক্ষ হিন্দু কাশ্মীরী পণ্ডিতকে হয় খুন, নয়তো গৃহচ্যুত করে জেহাদী জঙ্গিপনায় সেখানে সাধিত হয়েছে 'এথনিক ক্লিনসিং'। এই তথ্য উল্লেখ করে আমেরিকার প্রতিনিধি সভায় কংগ্রেস সদস্য ফ্র্যাঙ্ক প্যালোন ২০০৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরী পণ্ডিত-নিধনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা তথ্যানুযায়ী, জঙ্গি সন্ত্রাসের শিকার হয়ে অন্ততঃ ৭ লক্ষ হিন্দু কাশ্মীরী পণ্ডিত নিজভূমি কাশ্মীর থেকে পালিয়ে জম্মুতে আশ্রয় নিয়ে উদ্বাস্তুর মতো জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

২০০৯-তে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ একটি তথ্যে উল্লেখ করেন যে ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত দু'দশকে জঙ্গিরা ১৪,৮০৮ জন মুসলিম, ১,৭৪৮ জন হিন্দু এবং ১১৫ জন শিখ-কে হত্যা করেছে। হতে পারে যে তথ্যটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র কিংবা নিহত হিন্দুদের সংখ্যায় যতই জল মেশানো থাক না কেন একথা অনস্বীকার্য—উপত্যকায় জঙ্গি ভয়াবহতা তথ্যটির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। আরেকটি সরকারী তথ্যে জানা যাচ্ছে—স্রেফ ১৯৯৯ সালেই (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর অবধি) কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিদের হাতে খুন হয়েছিলেন ৯,৭৩৩ জন নিরীহ সাধারণ নাগরিক।

২০০৬ সালে মার্কিন হাউস অব্ রিপ্রেসেনটেটিভ এবং সেনেট-এ গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—(১) মার্কিন কংগ্রেস কঠোর ভাষায় কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপর যে মানবাধিকার লঙঘন করা হয়েছে তার নিন্দা করছে। (২) মার্কিন কংগ্রেস ভারত সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য-সরকারকে অনুরোধ করছে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং তাঁদের শারীরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চি ত করতে উদ্যোগ নিন। (৩) কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফেরাতে এবং পণ্ডিত সমস্যার সামঞ্জস্য-পূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ভারত-সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীরের সরকারের পারস্পরিক আলোচনাকে মার্কিন কংগ্রেস সমর্থন করছে। মার্কিন কংগ্রেস মনে করে এব্যাপারে যে সমাধান সূত্রই নেওয়া হোক না কেন তা যেন অবশ্যই কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ এই আলোচনা-প্রক্রিয়ায় তাঁরাও একটি অংশ। মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব যতই কাশ্মীর সমস্যায় ত্রিপাক্ষিক ইন্ধনের ইঙ্গিত দিক, কাশ্মীরী পন্ডিতদের শোচনীয় অবস্থাটাও কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

জঙ্গি হানায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু।

> ২০০৯-এর ১৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ম্বরে ঘোষণা করল, জম্মু-কাশ্মীর থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কারণ, আইন-শৃঙ্খলার নাকি অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। যদিও ২০০৯ সালেই ২৪২ জন জঙ্গি ও ২০১০ সালে ১৯১ জন জঙ্গির মৃত্যু—এহেন সরকারি যুক্তির ১৮০ ডিগ্রি বিরুদ্ধেই গিয়েছে।

জঙ্গি নাশকতায় পাক-মদতদান

সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে জঙ্গি-নাশকতায় পাক-মদতদান এখন আর কারুর কাছেই অজানা নয়। তবে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সরকারী কার্যকলাপ কেবল 'জঙ্গি কাজে মদতদান'—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পাক-সরকার নিজেই এখানে জঙ্গির ভূমিকায়। আন্তর্জাতিক কাশ্মীর অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে ২০০৮ সালের ৮-৯ এপ্রিল ব্রুসেলে ইউরোপীয় সংসদের যে দু'দিনের সম্মেলন আয়োজিত হয় তাতে সংসদের অধিকাংশ সদস্যই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালতিস্তানে পাকিস্তান সরকারের মদতে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেইসাথে উত্তর কাশ্মীরে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বার্তাও পাক সরকারকে দেন তাঁরা। পাক-অধিগৃহীত কাশ্মীরের 'আজাদী'র জন্য লড়াই করা বালাওয়ারিস্তান ন্যাশানাল ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ খান তাতে স্বীকার করে নেন, '১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার এবং মুসলিম কনফারেন্সের নেতাদের মধ্যে যখন করাচি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গিলগিট-বালতিস্তানের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না'। ২০০৭-এর ২৫ এপ্রিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 'কাশ্মীর ঃ বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা' শীর্ষক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় তার ২ নম্বর ধারায় বলা হয় গিলগিট-বালতিস্তানে কোনও 'গণতন্ত্র' বর্তমান নেই এবং ৩২ নম্বর ধারায় সেখানে 'মানবাধিকার লঙ্ঘনে'র কথা উল্লেখ করা হয়। ২০০৮-এ ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি-র পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয় তাতে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে একপ্রকার পরাধীন (Not Free) বলেই মন্তব্য করা হয়। প্রসঙ্গত, বালাওয়ারিস্তান ন্যাশনাল ফ্রন্ট এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানায় হতাহতের খতিয়ান ঃ ১৯৮৮-২০১০

	ঘটনা	সাধারণ মানুষ	নিরাপত্তা রক্ষী	সন্ত্রাসবাদী	মোট
১৯৮৮	৩৯০	২৯	১	১	৩১
১৯৮৯	২১৫৪	৭৯	১৩	০	৯২
১৯৯০	৩৯০৫	৮৬২	১৩২	১৮৩	১১৭৭
১৯৯১	৩১২২	৫৯৪	১৮৫	৬১৪	১৩৯৩
১৯৯২	৪৯৭১	৮৫৯	১৭৭	৮৭৩	১৯০৯
১৯৯৩	৪৪৫৭	১০২৩	২১৬	১৩২৮	২৫৬৭
১৯৯৪	৪৪৮৪	১০১২	২৩৬	১৬৫১	২৮৯৯
১৯৯৫	৪৪৭৯	১১৬১	২৯৭	১৩৩৮	২৭৯৬
১৯৯৬	৪২২৪	১৩৩৩	৩৭৬	১১৯৪	২৯০৩
১৯৯৭	৩০০৪	৮৪০	৩৫৫	১১৭৭	২৩৭২
১৯৯৮	২৯৯৩	৮৭৭	৩৩৯	১০৪৫	২২৬১
১৯৯৯	২৯৩৮	৭৯৯	৫৫৫	১১৮৪	২৫৩৮
২০০০	২৮৩৫	৮৪২	৬৩৮	১৮০৮	৩২৮৮
২০০১	৩২৭৮	১০৬৭	৫৯০	২৮৫০	৪৫০৭
২০০২	জানা যায়নি	৮৩৯	৪৬৯	১৭১৪	৩০২২
২০০৩	জানা যায়নি	৬৫৮	৩৩৮	১৫৪৬	২৫৪২
২০০৪	জানা যায়নি	৫৩৪	৩২৫	৯৫১	১৮১০
২০০৫	জানা যায়নি	৫২১	২১৮	১০০০	১৭৩৯
২০০৬	জানা যায়নি	৩৪৯	১৬৮	৫৯৯	১১১৬
২০০৭	জানা যায়নি	১৬৪	১২১	৪৯২	৭৭৭
২০০৮	জানা যায়নি	৬৯	৯০	৩৮২	৫৪১
২০০৯	জানা যায়নি	৫৫	৭৮	২৪২	৩৭৫
২০১০★	জানা যায়নি	২৯	৫৮	১৯১	২৭৮
মোট	**৪৭২৩৪**	**১৪৫৯৫**	**৫৯৭৫**	**২২৩৬৩**	**৪২৯৩৩**

★ *১লা আগষ্ট ২০১০ পর্যন্ত সরকারী তথ্যানুযায়ী প্রাপ্ত।*

পাক-সরকারের হাত থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' করতে আন্দোলন করছে।

সাম্প্রতিক জঙ্গিস্থান কাশ্মীর

২০০৪ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটে। এন ডি এ আমলের অবসান ঘটে, সূচনা হয় ইউ পি এ যুগের। ২০০৩ সালে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী লাইন অব্ কন্ট্রোল বরাবর সীমারেখা (ফেন্সিং) দিতে থাকে। প্রবল অন্তর্জাতিক চাপের মুখে ইসলামাবাদও অন্ততঃ প্রকাশ্যে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে মদতদান থেকে বিরত থাকে। ২০০৪-এ ক্ষমতায় এসে এই অনুকূল অবস্থার মধ্যেও কংগ্রেস সরকার প্রথম যে মারাত্মক ভুলটা করল তা হলো কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানের দেখাদেখি সেনা প্রত্যাহার করে সেনা-সংখ্যা বেশ কমিয়ে ফেলল। যা চরম পূর্ণতা পেল গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ম্বরে ঘোষণা করল জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩০,০০০ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কারণ আইন-শৃঙ্খলার নাকি অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে! যদিও ২০০৯ সালে ২৪২ জন জঙ্গি ও ২০১০ সালে (আগস্ট পর্যন্ত) ১৯১ জন জঙ্গির মৃত্যু (সারণী দ্রষ্টব্য) এহেন সরকারি যুক্তির ১৮০° বিরুদ্ধেই গিয়েছে। বরং এটা প্রমাণ করেছে সেনা কমলে জঙ্গি দৌরাত্ম্যপনা আরও বাড়বে। তাদের দ্বিতীয় মারাত্মক ভুলটা হলো, ভয়ংকর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে থাকা কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হওয়া। এমনিতে পাক-সেনাবাহিনীর ওপর পাকিস্তান সরকারের যতটা না প্রভাব রয়েছে, তার বহুগুণ প্রভাব রয়েছে জেহাদি-জঙ্গি সংগঠনগুলোর। সেটা অচিরেই বুঝতে পারল ভারতের সেনাবাহিনী। তারা দেখতে পেল যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও সীমান্তের ওপর থেকে মাঝে-মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে। হকচকানো ভাবটা কাটিয়ে উঠে তারা বুঝতে পারল, জেহাদি জঙ্গিরা পাক-সেনাবাহিনীর গুলি চালনার সুযোগে ভারত-সীমান্তে অনুপ্রবেশ করছে। ইউ পি এ সরকারের অপরিণামদর্শিতায় এভাবে-ই আজ জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। এমনকী, পাক-প্রেসিডেন্ট হবার পর আসিফ আলি জারদারিও স্বীকার করে নেন—কাশ্মীরে 'আজাদী'র জন্য যেসব জঙ্গিরা লড়াই করছে তারা আসলে সন্ত্রাসবাদী। এবছরকে ধরে বিগত দু'দশকে উপত্যকায় জঙ্গি নাশকতার কিছু খতিয়ান দেখলেই তা স্পষ্ট হবে।

পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী ও আই এস আই প্রধান সুজা পাশা।

কাশ্মীরে অশান্তির পিছনে পাকিস্তান

মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ)

সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা এখন অশান্ত। গত জুন মাসে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে তরুণরা রাস্তায় নেমে 'আজাদির' দাবী করেছে। সুরক্ষা কর্মীদের উপর পাথর বৃষ্টি করছিল। রাজ্য প্রশাসন 'কারফিউ' জারি করেছে, কিন্তু 'কারফিউ' উল্লঙ্ঘন করে তরুণদের পাথর বৃষ্টি ছিল অব্যাহত। মাঝে মধ্যে পুলিশের গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ, থানা, পুলিশ চৌকির উপর হামলা। পুলিশ, সি আর পি এফ লাঠি চার্জ কাঁদানে গ্যাস এবং নিরুপায়ে গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। রবারের গুলিতে মানুষ আহত হচ্ছেন কিন্তু অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে গুলি চালনায় প্রায় প্রতিদিনই দু'চার জন আন্দোলনকারী নিহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। সামরিক অধিকর্তা বলেছেন, অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরও প্রশাসন সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সচল না করার জন্য অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এই পাথর বৃষ্টির আন্দোলন, আইন অমান্য এক নতুন ধরনের সন্ত্রাসের চেহারা। জানা যায় প্যালেস্টাইনে এই ধরনের সন্ত্রাসের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনী নাজেহাল। তাদেরও বহু সদস্য পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। সাধারণ নিরপরাধ কাশ্মীরের মানুষ চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। কারফিউ সেইসঙ্গে আন্দোলন, গুলি চালনা, মৃত্যু চক্রবৎ ঘটে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। পর্যটকরা কাশ্মীরকে বাদ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সুরক্ষা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি আলোচনা করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। কিছু সংগঠন দাবী করছেন সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নিতে হবে। কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লা সরকার মনে করেন, যদি এই আইন তুলে নেওয়া হয়, অথবা কয়েকটি ধারার পরিবর্তন করলে জনরোষ কিছুটা শান্ত হবে।

এই বিশেষ অধিকার আইনের বলে, সামরিক বাহিনী কোনও অঞ্চ ল ঘিরে ফেলতে, তল্লাসী করতে, গ্রেপ্তার করতে পারবে। আত্মরক্ষার্থে এবং পলায়নপর সন্ত্রাসবাদীকে গুলি করতে পারবে। এই শক্তি প্রয়োগের জন্য কেউ হতাহত হলে কোনও আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না। সামরিক বাহিনী মনে করে এই রক্ষাকবচ তুলে নিলে বাহিনী অকেজো হয়ে পড়বে এবং সত্য ও মিথ্যা মামলায় তারা জেরবার হবেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চ লেও এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শহরাঞ্চ লে সৈন্যবাহিনীর এই ক্ষমতার আড়ালে কোনও হতাহত হওয়ার ঘটনাই ঘটেনি। বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় বিগত কয়েক মাস ধরে আন্দোলনের মোকাবিলা করছে রাজ্যপুলিশ এবং

আধাসামরিক বাহিনী, অথচ দাবী উঠছে, সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের অশান্তি দূর করার প্রয়াসে সর্বদলীয় বৈঠক করেন। জম্মু কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লাহ (এন সি) এবং মেহবুবা মুফতি (পিডিপি) সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল আলোচনায় যোগদান করেন। কিন্তু ফলপ্রসূ কোনও সূত্র বেরিয়ে আসেনি। বিজেপি সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন রদ করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। সর্বদলীয় আলোচনায় স্থির হয়, সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল কাশ্মীরে গিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক দল, হুরিয়তের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগঠন এবং অন্য সমস্ত মানুষের বক্তব্য শুনেছেন। তবে এই প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফললাভ হয়নি। কারণ হুরিয়তের উভয়গোষ্ঠী আজাদির দাবীতে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। বিশেষ করে সৈয়দ আলি শাহ গিলানী শুধুমাত্র বিশেষ অধিকার আইনই নয়, সমগ্র সামরিক বাহিনীকেই কাশ্মীর থেকে তুলে নিতে হবে বলে দাবী করেছেন। সৈয়দ আলি শাহ গিলানী বহুদিন ধরেই জম্মু কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির দাবী করে আসছেন। তাঁর পক্ষে অন্যকিছু বলাও বোধহয় সম্ভব নয়, তিনি পাকিস্তানের বদান্যতায় তাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে বিক্রীত। ফলে অন্য কথা বললে মৌলভী ফারুকের পিতার পথেই তাঁকে যেতে হবে। পাকিস্তানী জেহাদিদের কাছে তাঁর প্রাণের মূল্য কিছুই থাকবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছেন, ভারতের সংবিধানের ভিতরে জম্মু কাশ্মীরে যা কিছু করা প্রয়োজন, তিনি তার জন্য প্রস্তুত। হিংসা ত্যাগ করে আলোচনায় আসতে হবে।

এ বছরের গোড়া থেকেই গোয়েন্দাসূত্র অনুযায়ী বহু সংখ্যায় পাকিস্তানী জেহাদিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখনও তারা নিরন্তর অনুপ্রবেশের প্রয়াস করে চলেছে। ফলে এই আন্দোলন স্থানীয় কাশ্মীরিদের একক আন্দোলন নয়। আরও এক সূত্রে খবর রয়েছে যে, প্রায় দশ হাজার কাশ্মীরি কিশোর, যুবক যারা জেহাদি এবং আই এস আইয়ের প্ররোচনায় মাসিক বেতনের লোভে পাকিস্তানে জেহাদি কর্মশালায় যোগদান করেছিল, তাদের নাকি স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, তারা ফিরে এসে ভারতের মূলস্রোতে মিশতে চায়। আসলে অনুপ্রবেশের মূল বাধা ভারতের সেনাবাহিনী। দিবারাত্র প্রাণের বিনিময়ে তারা অনুপ্রবেশের মূল পথগুলি এমনভাবে আগলে রেখেছেন। যার ফলে বহুসংখ্যায় অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ নিয়ে অনুপ্রবেশ কঠিন হয়ে গিয়েছে। ফলে যদি সামরিক বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন তুলে নেওয়া হয় অথবা শিথিল করা হয় তাহলে সামরিক বাহিনী সমস্যায় পড়বেন এবং রক্ষণাত্মক হয়ে পড়বেন। তাঁদের তেজ প্রশমিত হবে এবং তাঁরা অকারণ ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। মিথ্যা মামলা দায়ের করা এদেশে একটা মসৃণ কলায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সৈনিকরা খোলাখুলি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অপারগ। ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপার থেকে পাকিস্তান সরকার সোচ্চার হয়েছেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই আরম্ভ হয়েছে। এবং আগামীদিনে সেই লড়াই আরও জোরদার হবে।

দু'বার কাশ্মীর দখলের লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তান চোরাগোপ্তা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। হাজার ক্ষত সৃষ্টি করে ভারতীয় রক্তক্ষরণের স্ট্রাটেজির আরও একটা অভিনব উপায় এই প্রস্তর বৃষ্টির আন্দোলন। আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান কারগিলের নিয়ন্ত্রণ রেখা পার হয়ে কারগিলের ভারতীয় ঘাঁটিগুলি চোরের মতো দখল করেছিল। ভারতের সামরিক বাহিনী বহু ত্যাগ স্বীকার করে সেগুলি পুনরুদ্ধার করেছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের কোনও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে শুধুই

পাক সেনাপ্রধান কিয়ানি।

মিথ্যাচার। মুম্বই হামলা, জার্মান বেকারী হামলা ইত্যাদি তারই নিদর্শন। পরমাণু বোমা তৈরিও সেই চুরির ফসল। সেখানে গণতন্ত্র আই এস আই এবং সামরিক বাহিনীর নির্দেশে চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা গোপনে বলেও দিয়েছিল, জেহাদি সন্ত্রাসবাদ তারা ত্যাগ করবে না, ভারতের বিরুদ্ধে এটাই তাদের সুরক্ষা এবং দাবী আদায়ের অস্ত্র।

ভারতের গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং অধিকারের সুযোগে গিলানীর মতো মানুষ খোলাখুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেও বহাল তবিয়তে রয়েছেন, কিসের প্রলোভনে কাশ্মীরের মানুষকে তিনি সেই বিফল রাষ্ট্রে যোগদানের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলছেন? অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ কোন সুখদ গণতন্ত্র ভোগ করছেন?

আমার বিশ্বাস এই আন্দোলনের পিছনের নেতাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি বিধান করার প্রয়াস করতে হবে। কাশ্মীরের শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে অনাবশ্যক যন্ত্রণা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। কিশোর এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পর্যটন শিল্প, পশম শিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রয়াসগুলিকে জোরদার করতে পারলে, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের পেটোয়া হুরিয়তি এবং জেহাদির বিরুদ্ধেই সোচ্চার হওয়ার সাহস পাবেন। সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিরা কি মীমাংসার সূত্র পাবেন জানি না, কিন্তু পাক জেহাদিদের কাশ্মীর থেকে নির্মূল করতে সামরিক বাহিনী এবং অন্য সুরক্ষা কর্মীদের হাত শক্ত করাই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

কাশ্মীর এবং আর এস এস

প্রতিবেদক॥ কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত খুবই সরল। কাশ্মীর আমাদের। কাশ্মীর আমাদের ছিল, আমাদের আছে এবং আমাদের থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৪৮-৪৯ সালে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কী ধরনের কাজ করেছিলেন, উপত্যকাকে হিন্দুস্থানের অধিকারে রাখার জন্য কী অসামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তার ইতিহাস সেইভাবে লেখা হয়নি। সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কেউই ইতিহাস লেখার স্বার্থেও সঙ্ঘের পাহাড় কাঁপানো ইচ্ছাশক্তির বাস্তব রূপকে তুলে ধরার প্রয়াস করেনি। যাই হোক, এটা তাদেরই লজ্জা, ভবিষ্যৎ তাদেরই প্রশ্ন করবে, সঙ্ঘকে নয়।

শ্রীগুরুজী

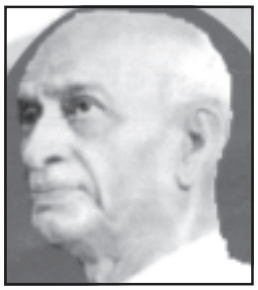

সর্দার প্যাটেল

প্রেমচাঁদ ডোগরা

বলরাজ মাধোক

মেহেরচাঁদ মহাজন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ১৯৪৭ সালের মে-জুন মাস থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়। সঙ্ঘ সেই সময় প্রথম কাজটি করেছিল, মহারাজা হরি সিংয়ের কাছে তাঁর প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেওয়া। কাক নিজে হিন্দু ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইংরাজ রমণী। ধর্মে খৃস্টান। পাকিস্তান কাককে উৎকোচ ও লোভ দেখিয়ে তাঁর মাধ্যমেই স্বাধীন জম্মু-কাশ্মীরের কথা মহারাজার মনে উস্কিয়ে দিয়ে 'স্থায়ী মহারাজা' হয়ে থাকার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। ইংরেজ এই ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক ছিল। আর. সি. কাক ভারত সরকারের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বিষয়ক আলোচনাটিকে পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে সময় করে দেওয়া এবং স্বীকার করতেই হয় যে, প্রধানমন্ত্রী কাক আংশিক সাফল্যও পেয়েছিলেন। কেননা, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি নির্ধারিত না হওয়ার জন্যই আজকের কাশ্মীর সমস্যা।

এই সময় আর এস এস জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির জন্য নানা জায়গায় সভা-শোভাযাত্রা বের করে। জম্মু থেকে ভারতভুক্তির সমর্থনে বিপুল সংখ্যায় গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মহারাজাকে পাঠায়। সঙ্ঘের এই আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় স্তরে। এই বিষয়ে জম্মুর সঙ্ঘচালক পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা, পাঞ্জাবের প্রান্ত সঙ্ঘচালক রায়বাহাদুর বদ্রীদাসজী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এইসব প্রয়াসের মূলে ছিলেন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর)। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি অধ্যাপক বলরাজ মাধকও মহারাজের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে একই প্রয়াস চালান। ক্রমে ভারতে যোগদানের বিষয়ে মহারাজের মন থেকে সংশয় দূর হতে থাকে।

সঙ্ঘের পক্ষে সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী ১৭ অক্টোবর ১৯৪৭ শ্রীনগরে গেলেন। ১৮ অক্টোবর শ্রীগুরুজী ও মহারাজ হরি সিংয়ের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় বাইরে প্রকাশ পায়নি। উপস্থিত সকলের চোখে মুখে আশার আলো দেখা গিয়েছিল। রাজপ্রাসাদ ত্যাগের আগে শ্রীগুরুজী মহারাজকে পরামর্শ দিলেন, "যুবরাজকে জম্মুতে পাঠিয়ে দিন। আপনি শ্রীনগরেই থাকুন যাতে মানুষের মনোবল অটুট থাকে। এখানে স্বয়ংসেবকরা আপনার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে।"

পরদিন ১৯ অক্টোবর ১৯৪৭, শ্রীগুরুজী কাশ্মীর থেকে চলে আসার সময় সঙ্ঘের প্রধান কার্যকর্তাদের বলেন, মহারাজার সঙ্গে যেন সব সময় যোগাযোগ রাখা হয়। তিনি যেন দ্বিধাবোধ না করেন। সঙ্ঘের পূর্ণ সহযোগিতার কথা মহারাজকে শ্রীগুরুজী বলে এসেছিলেন। শ্রীগুরুজী একথাও বলেছিলেন, 'কথাবার্তা (মহারাজার সঙ্গে) আন্তরিকতার সঙ্গে হয়েছে। আশার আলো দেখছি, তবু নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।'

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জানতেন, মহারাজের ওপর শ্রীগুরুজীর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মহারাজারও শ্রীগুরুজী এবং সঙ্ঘের ওপর শ্রদ্ধা রয়েছে। সর্দার প্যাটেল শ্রীগুরুজীর সফরে সহযোগিতা করেছিলেন। শ্রীগুরুজীও কাশ্মীর থেকে ফিরে সর্দার প্যাটেলকে মহারাজার ইতিবাচক মনোভাবের কথা বলেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মেহেরচাঁদ মহাজন তখন নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রী আর সি কাকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি পাঞ্জাবের সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিজে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির একজন জোরালো সমর্থক ছিলেন। তিনিও মহারাজকে শ্রীগুরুজীর বক্তব্যের সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন।

১৯ অক্টোবর শ্রীগুরুজী শ্রীনগরের ডি এ ভি কলেজের মাঠে প্রমুখ স্বয়ংসেবকদের এক সমাবেশে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রকারান্তরে ২০ অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে মহারাজা ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে সই করতে সম্মত হলেন। অলক্ষ্যে রইল শ্রীগুরুজী সহ সঙ্ঘকার্যকর্তাদের ভারতপ্রেমের অলিখিত অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

Swastika RNI No. 5257/57
13 December - 2010, Kashmir Spl.
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

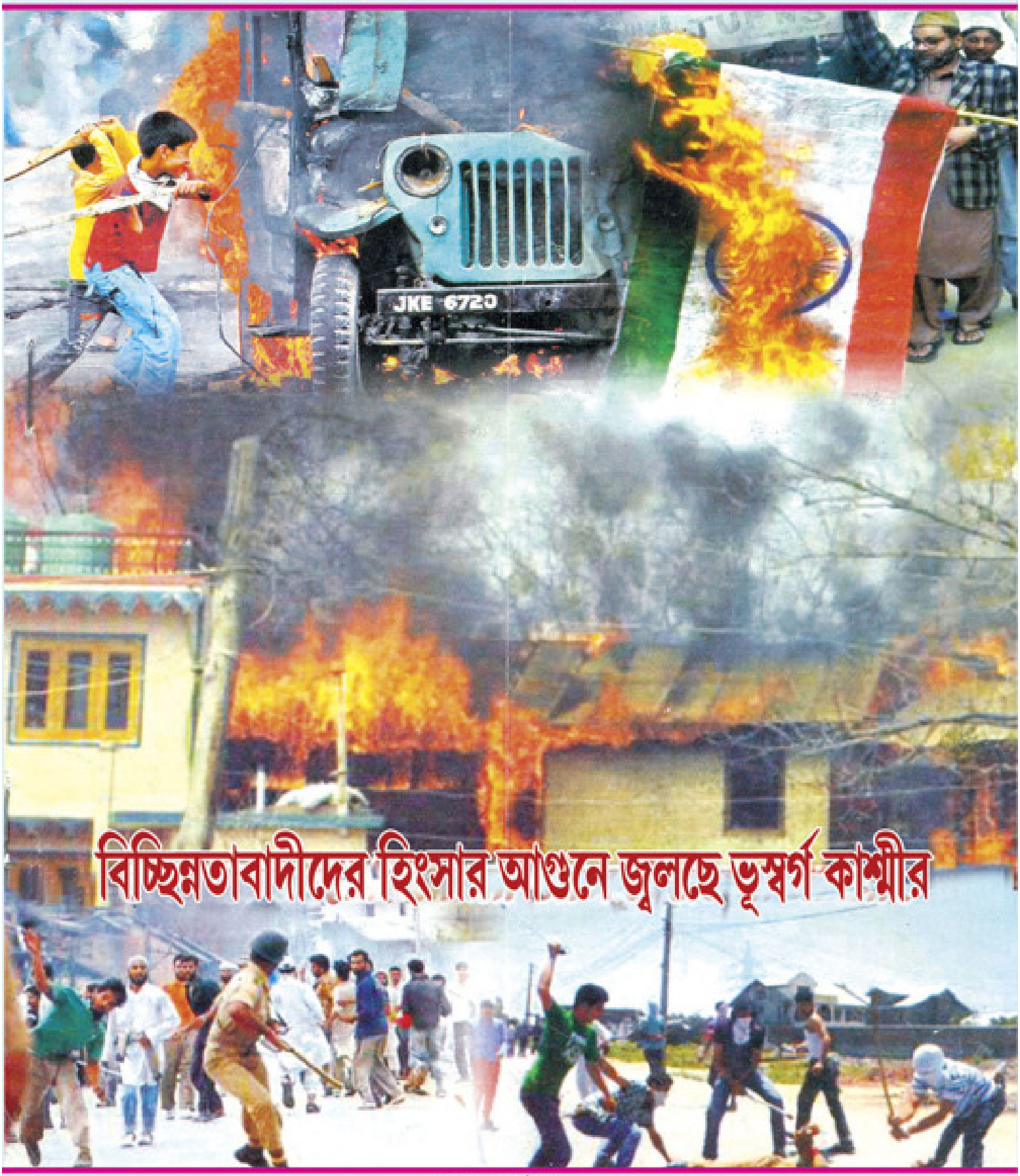

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসার আগুনে জ্বলছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর

দাম : ৫.০০ টাকা